তিনিই যশস্বী হইবেন। এই অত্যাচারীকে যিনি পরাজিত করিবেন, তিনিই সম্রাট্ হইবেন। এইরূপ দুর্দ্দান্ত দুরাত্মা জীবিত থাকিতে, আপনার রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, আশা নাই।"

তাহা শুনিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির বিষণ্ণ হইলেন। বলিলেন, "কৃষ্ণ, যখন তুমিই জরাসন্ধকে এত ভয় কর, তখন, আমরা তোমার আশ্রিত ও অনুগত হইয়া, কিরূপে সাহসী হইব (৩)? কাজেই রাজসূয় যজ্ঞের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইতেছে।"

তখন ভীম ও অর্জ্জুন তাহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ভীম বলিলেন, "দুর্ব্বল ব্যক্তিও সতত সতর্ক থাকিয়া আত্মরক্ষা করিয়া সম্যক্ নীতি-প্রয়োগে বলবানকে পরাজিত করিতে পারে। তবে আমরা কেন পারিব না? আমিই সেই অত্যাচারীকে নিহত করিব।"

অর্জ্জুন বলিলেন "লোকে বংশ-মর্য্যাদার প্রশংসা করে। কিন্তু তাহা কি শৌর্য্য বীর্য্যাদি গুণের সহিত তুলনীয়? গৌরবান্বিত বংশে জন্মিয়াও যদি লোকে কাপুরুষ হয়, গুণহীন হয়, তবে তাহার বংশ-মর্য্যাদা কোথায় থাকে? আবার কাপুরুষ বংশে জন্মিয়াও যদি লোকে শৌর্য্য-বীর্য্যাদি গুণ সম্পন্ন হয়, অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে স্বদেশ-উদ্ধার করে, তবে কে তাহার সম্মান না করে? ফলতঃ বংশ-গৌরব কোনক্রমেই পুরুষকারের সহিত তুলিত হইতে পারে না। আমরা সেই পুরুষকার দ্বারা অত্যাচারীকে বিনষ্ট করিব। আপনি অনুমতি দিন।"

তখন কৃষ্ণ বলিলেন, "রাজন, জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রমশালী, সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া, আমরা যদি তাহার অত্যাচার উৎপীড়ন দমন না করি, তবে আর কে করিবে? চিরদিন নিরাপদে থাকিয়া কে কোথায় উৎপীড়কের হস্ত হইতে স্বদেশ-উদ্ধার করিয়াছে? কেহই অমর হইয়া আসে নাই। তবে সৎকার্য্য করিয়া মরাই শ্রেয়। আমরা যদি আমাদের ছিদ্র গোপন করিয়া, শত্রুর ছিদ্র বাহির করিয়া সেই ছিদ্র-পথে তাহাকে আক্রমণ করি, তবে কেন না কৃতকার্য্য হইব? ধনুর্দ্ধারী বাণ প্রয়োগ করিয়া, মাত্র একজনকে নিহত করিতে পারে, না-ও পারে, কিন্তু বুদ্ধিমান বুদ্ধি-প্রয়োগ করিয়া, রাজা ও রাজ্য উভয়ই বিনষ্ট করে। পৃথিবীর সমুদয় বীরগণ একত্রিত হইলেও, সম্মুখ-সংগ্রামে, জরাসন্ধকে পরাজিত করা অসম্ভব। কিন্তু উহাকে বুদ্ধি-বলে বিনষ্ট করা সম্ভবপর।"

কৃষ্ণের কথায় রাজা যুধিষ্ঠির সম্মত হইলেন। বলিলেন, "কৃষ্ণ, একমাত্র তোমারই কথায়, তোমারই ভরসায়, আমি মত দিলাম। আমার প্রাণের অধিক ভ্রাতৃদ্বয়কে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম।"

কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুনকে লইয়া, ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে নির্গত হইলেন। সরযূ ও গণ্ডকী নদী পার হইয়া, মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরে গঙ্গা ও শোণ নদী অতিক্রম করিয়া, পূর্ব্ব মুখে গমন করিয়া, মগধ-রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে, তাঁহারা মগধের রাজধানীর পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতের উপরে উপনীত হইলেন। তথা হইতে, নগরীর শোভা ও সম্পদ্ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, "দেখ দেখ, গিরিব্রজ নগরীর চারিদিকে ঐ বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক নামক পঞ্চ-পর্ব্বত কেমন শোভা পাইতেছে! তাহারা পরস্পরের সহিত

(৩) সভাপর্ব্ব ১৫—৮।

সংযুক্ত হইয়া, যেন পরস্পর পরস্পরের হস্ত-ধারণ করিয়া মগধের রাজধানী গিরিব্রজকে রক্ষা করিতেছে। কুসুমময় লোধ্র-বনরাজি শৈল সমুদয়ের শরীর ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বিবিধ শ্যামল বৃক্ষ, কত লতা গুল্ম পর্ব্বত ছাইয়া রহিয়াছে। নগরীর মধ্যে কত সুন্দর সৌধ দেখা যাইতেছে। কত হৃষ্টপুষ্ট লোক ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে। কত স্থানে কত উৎসব হইতেছে। কত সৈন্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এখানে জলের অভাব নাই। প্রকৃতি-সুন্দরী যেন, এই মহা-নগরীকে রক্ষা করিবার জন্য, তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। এখানেই মহর্ষি গৌতমের আশ্রম। পূর্ব্বে মহাবল পরাক্রান্ত অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতির নৃপতিগণ এই আশ্রমে আসিয়া কতই আনন্দ উপভোগ করিতেন ?" (৪)

তাহারা দ্বার দিয়া গমন না করিয়া, পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। সকলেরই স্নাতক ব্রাহ্মণ বেশ। শরীর চন্দন-চর্চ্চিত, গলায় পুষ্পমালা ঝুলিতেছে। তাঁহারা জরাসন্ধের নিকটস্থ হইতেই, তিনি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, "রাজন, ইহারা ব্রত-ধারী। অৰ্দ্ধরাত্রি অতীত না হইলে, কথা বলিবেন না।" রাজা তাঁহাদিগকে যজ্ঞ-শালায় বিশ্রাম করিতে বলিলেন।

অৰ্দ্ধরাত্রি অতীত হইলে জরাসন্ধ তথায় গমন করিলেন। বলিলেন, "স্নাতক ব্রাহ্মণেরা পুষ্পমালা পরিধান করেন না। আপনারা আমার সংকারও গ্রহণ করিলেন না। আপনারা কে ? কেন আসিয়াছেন ?"

কৃষ্ণ উত্তর করিলেন, "আমি কৃষ্ণ, ইঁহারা ভীম ও অর্জ্জুন। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া, সাধু ও সজ্জন ক্ষত্রিয়-নৃপতিগণকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ। বিনা-অপরাধে তাহাদের স্বাধীনতা-হরণ করিয়াছ। বাহুবলে দৃপ্ত হইয়া, তাহাদিগকে দীর্ঘকাল কারাগারে রাখিয়াছ। ইহা অসহ্য। ইহা অপেক্ষা অন্যায়, অবৈধ কার্য্য আর কি আছে ? নর-বলি-দান নিতান্ত অধর্ম্মের কার্য্য। ইহা অপেক্ষা অত্যাচার, উৎপীড়নের কথা আর শুনি নাই। অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণ করা, সকলেরই কর্ত্তব্য কার্য্য। তাহা না করিলে, সকলেই অত্যাচারীর সহকারী বলিয়া, পাপের ভাগী হয়, অধর্ম্মে পতিত হয়। এইজন্য তোমার অত্যাচার হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিতে আমরা আসিয়াছি। হয়, তুমি বন্দীগণের স্বাধীনতা দাও, না হয়, আমাদের কাহারও সহিত মল্ল-যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দাও।"

সিংহ সিংহের সহিতই যুদ্ধ করিতে ভালবাসে। জরাসন্ধ ভীমের মহাবল শরীর দেখিয়া, উহাঁর সহিতই যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইলেন। দুই বীরে মল্ল-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহাদের হুহুঙ্কার শুনিয়া, নগরের বহু লোক ছুটিয়া আসিল। দুই বীর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইলেন না। কার্ত্তিক মাসের প্রতিপদ হইতে চতুর্দ্দশীর রাত্রি পর্য্যন্ত, ১৪ দিন, দিন ও রাত্রি, সমভাবে যুদ্ধ চলিল। ক্রমে মহাবল জরাসন্ধ শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ভীম তখন তাঁহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া, কুম্ভ-কারের চাকার ন্যায়,ঘুরাইতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাকে হত-বল করিয়া, শেষে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। অমনি তাঁহার পৃষ্ঠদেশে স্বীয় জানু স্থাপন করিয়া, শরীর ভগ্ন করিয়া নিহত করিলেন।

(৪) সভাপর্ব্ব ২১—৭।

তখনই তাহারা কারাগারে গমন করিলেন। অবিলম্বে বন্দীগণের স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। জরাসন্ধের পুত্র, সহদেব, তাহাদের বশ্যতা-স্বীকার করিলেন। বহু ধনরত্ন উপহার দিলেন। তাহারা তাঁহাকেই মগধের রাজা করিলেন। কৃষ্ণ এখন সকলকে লইয়া মহানন্দে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। তখনই বিজয়োৎসব আরম্ভ হইল। রাজা যুধিষ্ঠির কারামুক্ত নৃপতিগণের উপর যথেষ্ট সৌজন্য ও সোহাদ্য প্রদর্শন করিলেন। চারিদিকে কৃষ্ণের প্রশংসা হইতে লাগিল। কৃষ্ণ যে এই অতি দুষ্কর কার্য্য এমন অনায়াসে সুসম্পন্ন করিয়াছেন, অত্যাচারীর হস্ত হইতে দেশ উদ্ধার করিয়াছেন, সে জন্য সকলেই উঁহাকে অসাধারণ পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিতে লাগিল। এই দেশোপকারে তাঁহার বিমল যশের জ্যোতি, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বিনা গুণে কি কেহ কখনও যশস্বী হইতে পারে? সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া সহস্র সহস্র কণ্ঠে কীর্ত্তিত হইতে পারে? ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পূজিত হইতে পারে? ইহা বীর পূজা নয় ত কি?

ষষ্ঠ অধ্যায়। রাজসূয় যজ্ঞ।

একমাত্র সম্রাট্ রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অধিকারী। সম্রাট্ হইতে চাহিলে, চতুর্দিকের সমুদয় বশ্যতায় আনয়ন করা আবশ্যক। দিগ্বিজয় ব্যতীত তাহা সম্ভবপর নহে। ভারত যখন স্বাধীন ছিল, তখন দিগ্বিজয় মহাযশের বিষয় বলিয়া বর্ণিত হইত।

এখন ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব চারিভ্রাতা এক এক দিক্ জয় করিতে নির্গত হইলেন। বহু সৈন্য সামন্ত প্রত্যেকের সঙ্গে চলিল। যাহারা স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করিলেন, কর দিলেন, তাহাদের সহিত কেহ যুদ্ধ করিলেন না। তাঁহারা চারি ভ্রাতায় পৃথক পৃথক ভাবে কাশ্মীর, পুণ্ড্র (উত্তর বঙ্গ), বঙ্গ, যাবতীয় জলোদ্ভব দেশ, সাগর-তীরবর্ত্তী সমুদয় নদী মাতৃক স্থান (নিম্ন বঙ্গ), (৫) তাম্রলিপ্ত (তমলুক), প্রাগ্জ্যোতিষ (আসাম), শর্ম্ম, বম্ম, সুহ্ম, প্রসুহ্ম প্রভৃতি সমুদয় প্রদেশের সহিত বিশাল ভারতবর্ষ ও একাধিক দ্বীপ জয় করিলেন। কর্ণ বিনা যুদ্ধে কর দিতে সম্মত হইলেন না। ভীম তাঁহাকে রণে পরাজিত করিয়া কর আদায় করিলেন। অর্জ্জুন উত্তর ভারতবর্ষ জয় করিয়া চীন, দরদ, কাম্বোজ, বাহ্লীক, ঋষিকুল্যা, হিমালয়, ধবলগিরি, মান সরোবর, কিম্পুরুষ বর্ষ (তিব্বৎ) ও হরিবর্ষ (উত্তর কুরু, সাইবেরিয়া) জয় করিলেন। এইরূপে ভারতের দক্ষিণ-প্রান্তের কুমারিকা হইতে সাইবেরিয়ার উত্তর-প্রান্ত পর্য্যন্ত, এসিয়া মহাদেশের অধিকাংশ, ভারত-সাম্রাজ্য-ভুক্ত করিয়া, চারি ভ্রাতা অপরিসীম ধনরত্ন ও বহুবিধ দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া, মহা-গৌরবে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া আসিলেন। (৬)

নিমন্ত্রণ পাইয়া কৃষ্ণ সবান্ধবে আগমন করিয়াছেন। নকুল হস্তিনাপুর গিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি সমুদয় কৌরবগণ ও পুরনারীদিগকে লইয়া আসিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যার ভার অশ্বত্থামার উপর দিলেন। নানা দেশের নৃপতিগণের তত্ত্বাবধানের গুরু-ভার মহা-প্রাজ্ঞ সঞ্জয়ের উপর অর্পণ করিলেন। সর্ব্বপ্রকার উপহার দ্রব্য গ্রহণ করিতে রাজা দুর্য্যোধন নিযুক্ত হইলেন। স্বর্ণ ও রত্ন প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্য রক্ষার ভার লোভহীন কৃপাচার্য্য

(৫) সভাপর্ব্ব ৩০—৪।২৭। (৬) সভাপর্ব্ব ২৬ লাং, ৩২ অধ্যায়।

প্রাপ্ত হইলেন। সর্ব্বসাধারণকে সর্ব্বপ্রকার আহারীয় ও পানীয় দিতে দুঃশাসন নিযুক্ত হইলেন। আর এই মহাযজ্ঞের বিপুল অর্থব্যয়ের ভার, ধর্ম্মাত্মা বিদুর গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের অধীনে প্রত্যেক বিভাগে বহু ব্যক্তি কার্য্য করিতে লাগিল। ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্য যজ্ঞের যাবতীয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। আর কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র ও গদা লইয়া, যজ্ঞরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। (৭)

মহা সমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। বেদব্যাস প্রভৃতি কত মুনি ঋষি যজ্ঞে লিপ্ত হইলেন। নানা দিক্ দেশান্তর হইতে অগণিত নৃপতি বহু সৈন্যসহ আসিলেন। সকলেই স্ব স্ব দেশজাত বহুমূল্য ও বিচিত্র দ্রব্য সামগ্রী ও বহু ধন রত্ন উপহার দিতে লাগিলেন। সে সকল গ্রহণ করিতে করিতে, রাজা দুর্য্যোধনের হস্ত অবসন্ন হইতে লাগিল। উপহার প্রাপ্ত দ্রব্য-সামগ্রী পর্ব্বতাকারে পুঞ্জীকৃত হইয়া রহিল।

ক্রমে অভিষেকের দিন আসিল। কৃষ্ণ স্বয়ং শঙ্খোত্তম বাদন করিয়া, সুবর্ণ-কলস-পূর্ণ জল দ্বারা মহানন্দে রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিষেক কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। সমাগত সমুদয় নৃপতি বন্দনা ও বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

একদিন ভীষ্মদেব বলিলেন, "যুধিষ্ঠির, কত নৃপতি আসিয়াছেন, সকলের সৎকার কর। প্রত্যেককে একএকটী অর্ঘ দাও। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্ব প্রধান অর্ঘ দাও।"

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতামহ, কোন ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ? কাহাকে সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ দিব?

ভীষ্ম উত্তর করিলেন, "সমুদয় গ্রহগণের মধ্যে সূর্য্য যেমন, সমুদয় নৃপতিগণের মধ্যে কৃষ্ণও তেমনি।" (৮)

তখন যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাঁহার ভ্রাতা সহদেব কৃষ্ণকে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপ্রধান অর্ঘ প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ সে পূজা গ্রহণ করিলেন।

অমনি চেদি-রাজ শিশুপাল ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি সেই সভামধ্যে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন, "তুমি নিতান্ত বালক, ভীষ্মেরও বুদ্ধি-লোপ হইয়াছে। তোমরা কোন্ বিবেচনায় কৃষ্ণকে সর্ব্বপ্রধান অর্ঘ দিলে? যদি তাহাকে বয়োবৃদ্ধ বলিয়া পূজা করিয়া থাক, তবে তাহার পিতা এখানে থাকিতে, তাহাকে কেন পূজা করিলে? যদি হিতৈষী বলিয়া অর্চ্চনা করিয়া থাক, তবে দ্রুপদ-রাজ থাকিতে কৃষ্ণকে কেন অর্চ্চনা করিলে? যদি ঋত্বিক বলিয়া তাহার সম্মান করিয়া থাক, তবে এখানে বেদব্যাস থাকিতে কি করিয়া তাহার সম্মান করিলে? যদি বীর বলিয়া কৃষ্ণের পূজা করিয়া থাক, তবে এখানে ভীষ্ম, কর্ণ, একলব্য প্রভৃতি বীরগণ থাকিতে কেন তাহার পূজা করিলে? (৯) সে, না রাজা, না ঋত্বিক, না আচার্য্য—সে কিছুই নহে। যদি তাহাকে অর্ঘ দিয়া আমাদিগকে অপমানিত করাই তোমাদের অভিপ্রায় ছিল, তবে কেন আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলে?"

তারপরে শিশুপাল চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, "আর আমরা সকলে

---

(৭) সভাপর্ব্ব ৪৫—৩৯।　　(৮) সভার্ব্ব ৩৬—২৮।

(৯) সভার্ব্ব ৩৭—১৪।১৬। একলব্য নিষাদ-পুত্র, কর্ণ সারথি-পুত্র, বেদব্যাস জেলেনীর পুত্র, তথাপি তাঁহারা উপেক্ষিত হন নাই। সে সময় জাতি অপেক্ষা গুণের সমাদর অধিক ছিল।

এখানে থাকিতে, তুমিই বা এই পূজা কিরূপে গ্রহণ করিলে? অথবা নিকৃষ্ট কুকুর যেমন ঘৃত পাইলেই আনন্দে আহার করে, তুমিও তাহাই করিয়াছ। অন্ধের রূপ-দর্শনের কথা যেমন উপহাসের বিষয়, রাজা না হইয়াও তোমার রাজ-পূজা গ্রহণ, সেইরূপ উপহাসের বিষয়।"

শেষে শিশুপাল অন্যান্য নৃপতিগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া যজ্ঞ-ভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে শান্ত করিতে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, ফল হইল না। তখন ভীষ্মদেব উচ্চৈঃস্বরে সকলকে বলিতে লাগিলেন, "মনুষ্য-সমাজে কৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক গুণসম্পন্ন কে আছেন? দয়া, নম্রতা, জ্ঞান, শৌর্য্য, বীর্য্য, তুষ্টি, পুষ্টি প্রভৃতি অশেষ গুণ কৃষ্ণে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। (১০) ইনি জ্ঞানীগণের অগ্রণী, বীরগণের শিরোমণি। এখানে কে আছেন, যিনি কোন বিষয়ে কৃষ্ণকে অতিক্রম করিতে পারেন?"

তাহা শুনিয়া শিশুপাল ভীষ্মদেবকেও গালি দিতে লাগিল। তখন কৃষ্ণ অধীর হইলেন। এমন সময় শিশুপাল তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিলেন। তখন কেশব সকলকে বলিতে লাগিলেন, "এই পাপাত্মা দ্বারকা দগ্ধ করিয়াছে, আমার পিতার অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব চুরি করিয়াছে, তপস্বী অক্রূরের পত্নীকেও হরণ করিয়াছে। এ আমার পিসির পুত্র বলিয়া, আমি এতদিন ইহার অনেক অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি। আজ আর করিব না।" এই বলিয়া কৃষ্ণ চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। অমনি তাঁহার পক্ষের আর সমুদয় নৃপতি শান্ত ভাব ধারণ করিলেন এবং শিশুপালেরই নিন্দা করিতে লাগিলেন। মানুষ, তুমি কি বিচিত্র জীব!

রাজা যুধিষ্ঠির আদেশ দিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ শিশুপালের সৎকার করিলেন। পরে তাঁহার পুত্রকেই চেদিরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

এই যজ্ঞে প্রত্যহই সহস্র সহস্র ব্যক্তি রাত্রিদিন রন্ধন করিত, রাত্রিদিন পরিবেশন করিত, রাত্রিদিন অসংখ্য লোক আহার করিত। দ্রৌপদী স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া, অহরহ সমভাবে পরিশ্রম করিয়া এই ভোজন-ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং কেহ অভুক্ত থাকিত কি না দেখিতেন। যে পর্য্যন্ত একজন দরিদ্র পঙ্গুও অভুক্ত থাকিত, সে পর্য্যন্ত তিনি আহার করিতেন না। (১১) কুন্তীদেবী সকল দেখিয়া শুনিয়া আনন্দে বিভোর হইতে লাগিলেন।

ক্রমে রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। পঞ্চ পাণ্ডবের এখন সুখের সীমা নাই। রাজা যুধিষ্ঠির সমুদয় ভারতের সম্রাট বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন— শুধু সমুদয় ভারতই বা বলি কেন? এসিয়া মহাদেশের অধিকাংশের সম্রাট হইয়াছেন। তাঁহার শাসনগুণে তাঁহার রাজ্য ঐশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার ব্যবস্থায়, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি জনিত বিপদ, দস্যু-ভয়, ব্যাধি-ভয় অন্তর্হিত হইয়াছে। দ্রৌপদীর পঞ্চ-স্বামী দ্বারা পঞ্চ-পুত্র হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের অন্য ভার্য্যার গর্ভে এক পুত্র, ভীমের রাক্ষসী স্ত্রীর উদরে ঘটোৎকচ ও কাশীরাজ দুহিতার গর্ভে একপুত্র, অর্জ্জুনের সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যু, উলূপীর উদরে ইরাবান্ ও মণিপুর রাজকন্যার গর্ভে বভ্রুবাহন, নকুলের অন্য স্ত্রীর দ্বারা একপুত্র, এবং সহদেব মাতুল-কন্যা বিবাহ করায়, তাহার গর্ভে একপুত্র উৎপন্ন হইয়াছে। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ-স্নেহময়। মহাবল ভ্রাতৃগণ, অগ্রজে একান্ত অনুরক্ত, তাঁহার অত্যন্ত অনুগত। পঞ্চ-ভ্রাতাই ভ্রাতৃস্নেহের মূর্ত্তিমান আদর্শ। এখন সকলেই ভাবিতেছে, পঞ্চ-পাণ্ডবের ন্যায় সুখী কে? সৌভাগ্যশালী কে? কিন্তু কালের চক্র যে অবিরাম ঘুরিতেছে, তাহাই কেহ বুঝিল না। বুঝিল না, সুখ দুঃখের মধ্যে প্রভেদ অতি অল্প। (ক্রমশঃ)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

---

(১০) সভাপর্ব্ব ৩৮—১৯।২০। (১১) সভাপর্ব্ব ৫২—৪৮।

হিন্দু সমাজ।

আমরা মনের মধ্যে গণ্ডী টানিলামই বা,—ভ্রূ সঙ্কুচিত করিয়া চাহিলে, চক্ষুই আবছায়া দেখে; সত্যই আর সম্মুখের দৃশ্যবস্তুগুলি মুছিয়া যায় না। তেমনি, আমরা মনের মধ্যে গণ্ডী টানিলামই বা; সত্যই তাহাতে আমাদের দেশ, পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই। বিধাতাও বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া আমাদের জন্য বিধান রচনা করেন নাই। সমস্তই অবিচ্ছিন্ন, এক নিয়মেরই অধীন,—একাকার নয় ত' কি? সমাজ আমাদের সৃষ্ট একটা নূতন কিছু নহে। সমাজ বলিতে সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা কিছু লইয়া আমরা বসিয়া আছি, যেটার সম্বন্ধে বিশ্বের অপর সকলে অংশমাত্রও এখনও ধারণা করিতে পারে নাই, এমন নয়। সমাজ বলিতে যাহা আমাদের আছে মূলতঃ সেই জিনিষই দেশে দেশে, কালে কালে সর্ব্বত্রই আছে। সভ্য দেশে আছে, অসভ্য দেশে আছে। মানুষ সংজ্ঞা যাহাদের দেওয়া চলে তাহাদের মধ্যেই আছে। ইহাই যদি হয়, তখন, সমাজের দোহাই দিয়া, হিন্দু বলিতে একটা মাৎসর্য্য প্রকাশ, ভ্রূ সঙ্কুচিত করারই সমকক্ষ। ইহাতে দৃষ্টিই খর্ব্ব হইয়া উঠিতেছে, দৃশ্যের খর্ব্বতা জাগে নাই, জাগিবার সম্ভাবনাও পাইতেছি না।

যতই আমরা মনের সহিত বুঝা পড়া করিতেছি যে, আমাদের স্বাতন্ত্র্যই উচ্চ, ততই দেখিতে পাই, ওই দৃষ্টির খর্ব্বতার মত, আমাদেরই প্রকাশ-প্রভাব, এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মন্দতেজঃ হইয়া আসিতেছে। আজ অবস্থাই আমাকে উদ্দীপ্ত করিতেছে নূতন ভাবে চিন্তা করিতে, কেমন হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সন্দেহ ও শঙ্কা জাগাইয়াছে যে, বৈশিষ্ট্য-রক্ষা আত্মরক্ষার জন্য যে পথ হিন্দু এতদিন অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে, তাহার গন্তব্য স্থল, সর্ব্বনাশ। সে পথ, ঠিক্ পথ নহে। কবে, প্রমাদে পড়িয়া, আমরা এক পথে যাইতে আর এক পথ ধরিয়া বসিয়াছি। আজ ফিরিতেই হইবে।

মুনি ঋষির নিন্দা করিতেছি না। তাঁহাদের ত্রিকালদর্শী অভিজ্ঞতা সর্ব্বাংশেই শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। সেই অভিজ্ঞতার নির্দ্দেশবর্ত্তী হওয়ার যা' পরিণাম তা' যদি না পাইলাম, যদি দেখি, তাঁহাদের নির্দ্দেশবর্ত্তী হইয়া চলিলে যে সুফল পাওয়া যাইবে, তাঁহারা ভরসা দিয়াছেন, সে ফল মিলিল না, তখন যদি বলি, হয় এই নির্দ্দেশ-মত চলার মধ্যে ভুল আছে, নয় ত, নির্দ্দেশটাই ভুল, তবে কি মিথ্যা বলা হয়?

এইটাই আমার কথা। সমাজ-বন্ধনের মধ্যে জীবন-প্রকাশ যথেষ্টই বাধা পাইতেছে। আজ, হয় বলিতে হইবে যে, বন্ধনটা অনর্থক; নয় বলিতে হইবে, যে ভাবে আমরা বন্ধনটা অনুভব করিতেছি, সে ভাবটা অনর্থক। প্রকৃত বন্ধন কোথায়, সে আমরা গোল করিয়া ফেলিয়াছি। যেটা মানিতেছি, সেটার মধ্যে যখন মঙ্গলের আবিভাব কষ্ট-সাধ্য, তখন, মানিবার বস্তু প্রকৃত পক্ষে যেটা, সেটাকে কখন হারাইয়া ফেলিয়া, গোলমাল বাধাইয়াই, এইটাকে ধরিয়া বসিয়া আছি। একটু সন্ধান করিয়া, প্রকৃতটাকে আবার ধরিয়া লইতে হইবে। চোখ কান বুজিয়া, এটাকেই ধরিয়া থাকিয়া, জীবন-প্রকাশ বিলুপ্ত করিয়া দিতে থাকিব,

এমন জিদ্ যদি ভিতরে পাই, তবে বুঝিতে হইবে, সে আমাদের অন্তরাত্মার কথা নহে। কার যে কথা, সেটা বুঝিবার জন্য তপস্যার প্রয়োজন হইয়াছে। আর বাহির হইতে এমন চাপ্ যদি ঘাড়ে পড়ে, তবে বুঝিতে হইবে, ভগবানের একটু রুদ্র-লীলার অভিপ্রায় হইয়াছে, একটা বিপ্লব বাধিবেই।

এই যে সমস্ত দেশ ব্যাপী একটা নব দেশ-মানবের সকল স্তরকেই স্পর্শ করিয়াছে,— উন্নতি, উন্নতি— ইহার অর্থ কি? শরীর অবসাদে আচ্ছন্ন হইলে, তার পরই, তাহার মধ্য হইতে বিশ্রামের স্মরণ করিয়া, একটা চেতনা জাগিয়া উঠে। অনাহারের সকল লক্ষণ বিকাশিত হইলেই, তারপর আহারের জন্য দাবী প্রত্যেক স্নায়ুতন্ত্রীকে শিহরিত করিয়া, আপনাকে ঘোষিত করিয়া তোলে। এই একই নিয়মের বশে এই রব উঠে নাই কি? এই 'উন্নতি-উন্নতি'-ধ্বনি, আমরা অবনত এই চেতনা, সর্বপ্রকারে পরিস্ফুট হইবার পরেই, প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এ আর অস্বীকার চলে না।

সকল ক্ষেত্রেই সন্ধান চলিতেছে। সমাজ ক্ষেত্রের সন্ধান-স্পৃহা কত দিন ভ্রুকুটী প্রদর্শনে প্রতিরোধক্ষম হইতে পারে? মুনি ঋষিকে প্রণাম করি। তাঁহারা যে সকল অমূল্য সত্যরাজির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, আপনার অস্তিত্বের মতই, সমস্তের যাথার্থ্য আমার প্রত্যক্ষ গত। কিন্তু সেই সত্য ভিন্ন, জীবন-লব্ধ চেতনায় তাঁহারা বিশ্ব-বিধানের যে আবিষ্কার মালা দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভিন্ন তাঁহারা আর কিছুই রাখিয়া যান নাই, এই কথা আমি মুক্ত-কণ্ঠে বলিব। তাঁহারা করিয়া যান নাই এমন কোনও আদেশ, যাহার আর ব্যতিক্রম নাই। তাঁহারা রাখিয়া যান নাই এমন কোনও সম্প্রদায় যাহাদের শাসন, যাহাদের প্রাধান্য, অব্যাহত।

সুতরাং, সমাজ-সমস্যা সমাধানার্থ অন্ধের মত অনুবর্তিতার বিরুদ্ধে যদি নূতন করিয়া ভাবিতে হয়, ভাঙ্গিতে হয়, গড়িতে হয়, আমি কিছুতেই স্বীকার করিব না যে, তাহাতে আমাদের কাহারো আজ অধিকার নাই।

নিশ্চয়ই আছে। আমাদের মধ্যে যেই লোক। অধিকারী হইলে, সে অধিকার তাহার নিশ্চয়ই আছে। কেহই বন্ধ করিতে পারিবে না।

সমাজ-বন্ধনের রীতি ভাঙ্গা গড়ার বিরুদ্ধে যত প্রতিবাদ, চতুর্দ্দিকের এই বর্ত্তমান আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া, আধুনিক কাল তাহাকে থামাইয়া দিয়াছে। এখন প্রতিবাদ করা চলে মাত্র এই বলিয়া যে, ভাঙ্গা-গড়া অধিকারীত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া করিতেছ না; এটা তোমার স্বেচ্ছাচার। * সামাজিক-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এখন কেবল দেখিতে হইবে, স্বেচ্ছাচার করিয়া এই স্বাধীনতার আমরা অপব্যবহার না করিয়া বসি। বিপ্লবের জয় পরাজয় এইখানে নির্ভুল হওয়ার উপরই নির্ভর করে। প্রকৃত পথ এই—আগে অন্তরের স্বাধীনতা, তারপর বাহিরের বিপ্লব। এই পথই জয়ের পথ। আগে বাহিরে উদ্দাম বিপ্লবের সৃষ্টি, তারপর তাহারই ঘাত-প্রতিঘাতে অন্তরের স্বাধীনতা,—এ পথের উপর আমার বিশ্বাস নাই।

এই অন্তরের স্বাধীনতাকেই এখানে অধিকারীত্ব বলিতেছি। ইহা লাভ করিতে হইলে,

গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে। অকুতোভয় অবিচল হইয়া, সত্যের সহিত মুখোমুখি দাড়াইতে হইবে। মর্ম্মের সকল গ্রন্থি ছেদন করিয়া, তাহাকে অবলম্বন করিতেই হইবে।

কেমন করিয়া তাহা হইতে পারে? প্রথমতঃ, প্রতিষ্ঠিত অভ্যাস প্রবণতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, মনের মুক্ত-বিহঙ্গমকে সচেতন হইতে হইবে, প্রকৃতির বিশাল রাজ্যের রাজ নীতিতে। তবে ত সে আপনার কাজ খুঁজিয়া পাইবে। এই খোঁজার মূলে আছে, শেখা। সমাজ সম্বন্ধে চিন্তা তখনই আমরা করিতে পারিব, যখন সমাজ-তত্ত্বের গূঢ় মর্ম্মে আমরা প্রবেশ করিয়াছি, যখন তাহার সকল গুপ্ত রহস্য আমরা শিখাইয়া লইয়াছি। তার পূর্ব্বে সম্ভব হইবে না। জগতে মানুষ দেখিয়া শেখে, শুনিয়া শেখে, আর শেখে, ঠেকিয়া। যে জাতির কাছে পর-সংশ্রব পরিহারই স্বাতন্ত্র্য আর তাহাই বৈশিষ্ট্য-রক্ষার উপায়, তাহার দেখিয়া বা শুনিয়া শিখিবার মত বুদ্ধি শুদ্ধি নহে। বাকি, ঠেকিয়া শেখা। কিন্তু জানি, যে ব্যক্তি এমন করিয়া অহঙ্কারে ভরপুর, যে বিরাট পুরুষের মত, সে বিশ্বে একাই একা। আপনার ইতিহাসই তাহার যথেষ্ট, আপনার অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসের বাহিরে আর তাহার কাছে পৃথিবী বলিয়া কিছু নাই, তাহার ঠেকিয়া শেখাও কাজের হয় না। চোখ্ কান বুজিয়া যে আচার অবলম্বন করিয়া আছি, তাহাই লইয়া থাকিব,—জীবন প্রবাহ বিলুপ্ত হয় কি করিতে পারি,—সমাজ পুরুষের মধ্যে হিন্দুর এই জিদ্ যতখানি আছে, সে এই মনস্তত্ত্বের স্তরেরই।

এই জন্যই দেশকাল সংঘর্ষে দাঁড়াইয়া যুগধর্ম্মকে জয়ী করিতেছে। নূতনের অভিযান কিছুতেই প্রতিহত হইতেছে না। কিন্তু মাত্র মনের উপর যুগধর্ম্মের জয়, জয় নহে, সে আজ বিভিন্ন নামে নামে বহুদিনই হইয়া আসিতেছে। এই যুগধর্ম্মের ভিত্তির উপর সমাজ-স্থাপনই, নূতনের পূর্ণ জয়। পুরাতন কিছুতেই বাঁচিবার নয়। সে যে কিছুতেই শিখিবে না। বাঁকের মুখে বাধিয়া গিয়া নদী-স্রোত যতই পঙ্কিল হউক—নিশ্চেষ্ট থাকে না। তেমনি পুরাতনের বাঁকে বাধিয়া জীবন-স্রোত যতই ক্ষীণ বিশুষ্ক হইয়া আসিতেছে, জানিও, পুরাতনকে বসাইবার ততই সে উপযুক্ত হইয়া উঠিতেছে মাত্র।

মানুষ গৃহ-নির্ম্মাণ করে, বাস করিবার জন্য। তেমনি, সমাজ-নির্ম্মাণও, তাহার এই গৃহগুলি আবার তাহার মধ্যে বাস করিবে বলিয়া। তাহার আপনার জন্য গৃহের যে প্রয়োজন, গৃহগুলির জন্য সমাজের সেই প্রয়োজন। এই গৃহ জীর্ণ হয়, তখন সংস্কার না হইলে চলে না। অত কি, বর্ষে বর্ষে সুধাধৌত ধবলিত করিয়া, মলিনতার হাত হইতে, অস্বাস্থ্যের আক্রমণ হইতে, ইহাকে রক্ষা করাই রীতি-সঙ্গত। ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়াও, গৃহস্বামীর পক্ষে অমঙ্গল, অগৌরবের কথা নহে। কিন্তু গৃহ কত পবিত্র। পুরুষানুক্রমের আবাস, ভদ্রাসন, কত স্মৃতি, কত শ্রদ্ধা-মমতা ইহার উপর সঞ্চিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সে কি ওই জীর্ণ-সংস্কারের সহিত অন্তর্হিত হয়? ইহাকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার সময়, পুরাতন উপাদান-পুঞ্জের সহিত সে কি কেহ বহিয়া লইয়া যাইতে পারে? গৃহের পবিত্রতা, গৃহের উপর মমত্ব-বোধ, সে ত ইঁট কাঠকে অবলম্বন করিয়া রহে না, সে থাকে স্মৃতিতে, সে রহে অনুভূতিতে। মনের উপর, সেই যে কত বহু দিন হইতে, প্রপিতামহ পিতামহ পিতা, কেহ সম্পদে, কেহ বিপদে,

কেহ দারিদ্র্যে, একই স্নেহ একই ভালবাসা, হাসি কান্না সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া, একটা রক্তের প্রবাহ, একটা চরিত্রের বিশেষ ভঙ্গীর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহারই প্রভাব না গৃহ? পুরাতন বাড়ীর কাড়কাঠখানি বদলাইতে কেহ কাতর হন না, এই ধারাটি পরিবর্ত্তিত হইবার আশঙ্কা হইলেই, গৃহবাসী সজল নয়নে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

সমাজ-গৃহেরও ত আর নূতন কোনও ব্যাখ্যা নাই। এটা, ব্যষ্টি-পরিবারের,—ওটা, সমষ্টি-পরিবারের, বাস-গৃহ। রীতি নীতি, বিধি ব্যবস্থা এগুলিই ত সমাজ প্রতিষ্ঠানের জড় স্থূল-দেহ গড়িবার কাঠ কাঠরা, ইট পাথর। যদি তাই হইল, যদি এইগুলিকে বুক দিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া, জাতি বলিল—'আমার সর্ব্বস্ব আমি রক্ষা করিতেছি। ওগো, ও স্তূপাকার আবর্জ্জনা যে আমার ওই দেয়ালটা ধসিয়া জমা হইয়াছে। তুমি বলিতেছ, সাপের বাসা, তা আমার কি করিবার আছে? ও যে আমার ধসিয়া পড়া দেয়াল।'—তবে আর কি বলিব? দীর্ঘশ্বাসে এই বলিতে হইবে যে সংস্কারাভাবে, জীর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠান চাপা পড়িয়া জাতি মরিয়া গিয়াছে। এখানে আর কোনও ভরসা নাই। এ মানব-সমষ্টি পশুযথের মত এখানে জমা হইয়া আছে। মানুষে ইহাকে চরাইবে, মানুষের মত চলিয়া ফিরিয়া কাজ কর্ম্মে ঘুরিয়া বেড়াইতে ইহারা জানে না।

ঘরে মানুষ থাকিলে যেমন তাহার সৌষ্ঠব দৃষ্টেই চেনা যায়, তেমনি সমাজ প্রতিষ্ঠান মধ্যে, জাতির প্রাণ টিঁকিয়া থাকিলে, তাহাও সৌষ্ঠবে জ্ঞাতব্য। সর্ব্বত্রই একটা নূতন নূতন, একটা মাজা ঘষা, তক্ তকে ভাব, একটা শুচিতা, একটা গমগমে ব্যাপার। তার মানে, মানুষ তখন তার মধ্যে, যৌবনের স্ফীতিতে কানে কানে, তার প্রাণ-প্রবাহ তর্ তর্ বেগে ছুটিয়াছে। সেখানে কেবল সার্থকতা।

The principal aim of society is to protect individuals in the enjoyment of those absolute rights which were vested in them by the immutable laws of nature —*Blackstone*—সত্যই। ইহার অধিক আর কিছুই নাই। স্পষ্টই বল, ঘুরাইয়াই বল, দেবতার প্রবাহ প্রতিষ্ঠিত হউক, আর মুনি ঋষি সন্ন্যাসী যাহারা দ্বারাই হউক, ইহাই সমাজের অভ্যন্তর নিহিত মূল উদ্দেশ্য। ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই এক প্রেরণাই, বুদ্ধির রঙ্গিন কাচে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, জগতে বিভিন্ন আদর্শ, বিভিন্ন উদাহরণ প্রকটিত করিয়াছে। দেশে দেশে আবহাওয়া, মানুষের অভাব, ক্ষমতা অক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া, তাহাদের রীতি নীতির স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া, এই মূল লক্ষ্যই তাহাদের পৃথক পৃথক সমাজের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। তুমি আমি, আমাদের মধ্যে দুর্ব্বল ব্যক্তিটাও, সকলেই প্রকৃতির সৃষ্ট, প্রকৃতি দ্বারাই চালিত। প্রকৃতিই আমরা এবং প্রকৃতিরই আমরা। তাই, তাহারই বিকাশ, তাহারই স্ফুরণ, আমাদের মধ্যে ঐ absolute right রূপে,—আর সেই বিকাশের শৃঙ্খলা বিধানের প্রেরণাই the aim of society-রূপে আমরা আমাদের বুদ্ধির মধ্যে অনুভব করিতেছি। যিনি জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন, জীবনের সার্থকতাই তাঁহার সৃষ্টির লক্ষ্য,। তাহারই উদ্দেশ্যে ঐ শৃঙ্খলা-বিধান-ই প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠা তাঁহারই কাজ। আমরা বুঝিতে পারি না, বুঝি, এই অহঙ্কার সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়া, তিনিই যে আমাদের

কানামাছি খেলাইতেছেন। এই জন্যই সমাজ একটা প্রকাণ্ড positive ব্যাপার। ইংরেজী লেখক Paine এর কথা—society is produced by our wants; আর ইহার কাজ কি?—*promotes our happiness positively by uniting our affections.*

হিন্দু সমাজের নেতি-বাদ নাসিকা সাট্‌কার মাহাত্ম্য কেমন করিয়া আসিয়াছে—সে অনেক কথা, প্রবন্ধান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। এখানে কেবল মাত্র বলিতেছি, জোর দিয়াই বলিতেছি, সমাজ একটা positive ব্যাপার, negative, নেতি নেতি, না-না-ধ্বনি এখানে স্বাভাবিক নহে।

বহুদিন পূর্ব্বে কি একখানা ইংরাজি পুস্তকে—লেখকের নাম বলি Idem,—সমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে চমৎকার একটা বর্ণনা পাঠ করিয়াছিলাম। সব ভুলিয়া গিয়াছি, বর্ণনাটুকু এখনও মনে রহিয়াছে, সে টুকু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না—

ধর পৃথিবীর কোনও লোকালয়-বিচ্ছিন্ন প্রান্তে জন কতক কোনও রূপে গিয়া পড়িয়াছে, পৃথিবীর আদিম-মানবের মত তাহারা যেন সেখানের আদিম মানবে পর্য্যবসিত হইল। তাহারা স্বাধীন, স্বতন্ত্র, কাহারো কাছে কাহারো কোনও বাধ্য-বাধকতা নাই। প্রথম কোন্ অভাব তাহাদের মধ্যে অনুভূত হইবে? এই সমাজেরই অভাব। জাগিবে না তাহাদের আপন ইচ্ছায়। সহস্র দিক হইতে অজস্র শক্তির তাড়নায় উত্তেজিত হইয়াই তাহা জাগিবে, জানিও। তুমি মানুষ তোমার অভাব আছে অনন্ত, কিন্তু, সকল অভাব পূরণের উপযুক্ত শক্তি, তোমার একার নাই। তোমার আছে মন, সে সবার হইতে বিচ্ছিন্ন বটে, কিন্তু, সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা তাহার স্বধর্ম্ম নহে। মানুষের মানুষ চাই-ই,—সাহায্যের দিগ দিয়া, সুখের দিক দিয়া, মানুষের মানুষ চাই ই। এমনি করিয়া স্বল্প কালের মধ্যেই, তাহাদের একথা সমষ্টি-বোধের অন্তর্গত হইয়া পড়িতে হইবেই। একটা বাস-গৃহ তুলিতে গেলেই ত সেখানে মানুষে মানুষে সম্মিলিত হইতে হয়। আহার আচ্ছাদন মানুষের যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, কোনওটাই মানুষ আপনি আপনার জন্য সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবে, তেমন করিয়া তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা তাহাকে গড়েন নাই। সুতরাং, মাধ্যাকর্ষণ যেমন প্রত্যেক বস্তুটাকে আপনার দিকে টানিতেছে, তেমন, ঐ অভাব-বোধ, ঠিক্ ঐ নিয়মেই, প্রত্যেক মানুষটাকে অপরের দিকে টানিতেছে। মানুষ থাকিলেই সমাজ, আর সেই সমাজ দিনে দিনে যত বড় হইতে থাকিবে, ততই তাহার সমস্যা জটিল হইয়া, তাহাকে নানা অঙ্গে সুশোভিত করিয়া তুলিবে।

সকল লোকালয়েই এমনি করিয়া আদিম মানবের ক্ষুদ্র প্রয়োজন-মূলক মিলন, আদিম-সমাজের উৎপত্তি করিয়াছিল। তারপর, তাহাদের জটিলতা ও তাহারই সমাধান-কল্পে, নব নব প্রতিষ্ঠারই সমাবেশ, বর্ত্তমান সমাজ। ভারতীয় সমাজের পক্ষে নূতন কোনও কথা নাই। সরল স্বল্পাড়ম্বর পিতৃজাতি পঞ্চনদের পুণ্যভূমিতে সুগম্ভীর বেদচ্ছন্দে অন্ধকারের পর প্রারস্থ দিব্য জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের বন্দনা গান গাহিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেইটাই তাঁহাদের একমাত্র দিক্ নহে। তাঁহাদের জীবনে আর একটা দিক আছে, যে দিকে তাঁহারা বন-ভূমিতে

পর্ণকুটীর বাঁধিয়াছেন, পুত্র দুহিতৃগুলিকে লইয়া হোমধেনুগুলির পরিচর্য্যা করিয়াছেন, অনার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, প্রবাও পক্ককাণ্ড সকল বহিয়া আনিয়া, গ্রাম প্রান্তের প্রাচীর গুলিকে সুরক্ষিত করিয়াছেন। তার পর, সেই বেদ গানের ছন্দঃ ভাব, তাহাই যে কেবল ক্রমশঃ সুন্দর ও গভীর হইয়াছে, তাহাই নহে। তাঁহারাও নব নব ভূমি জয় করিয়াছেন, সুবিস্তীর্ণ ক্ষিথণ্ড কর্ষিতের আকারে পরিণত করিতে, শমকার্য্যে, পরাজিত অরাতিকে তাঁহাদের নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। তাঁহাদের, সতর্ক দৃষ্টিতে, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইয়াছে। স্বল্প সংখ্যক হইয়াও, বিশালদেশে, প্রচুর অরাতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়া অনিবার্য্য হওয়ায়, নিজের প্রতি কঠোর সংযম ও শত্রুর প্রতি কঠোর নিঠুরতা প্রবর্ত্তিত করিয়া, স্বভাবের মাধুর্য্যকে খর্ব্ব করিয়া আনিতে হইয়াছে। তার পর, আরও শতাব্দীর পর শতাব্দী গিয়াছে। যে সকল দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিতেছিলেন, তাঁহাদের ভাব মূর্ত্তিকে কেবল যে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিয়াই তাঁহাদের জীবনের কাজ শেষ হইয়াছে, তাহা নহে। এ দিকেও, সেই পর্ণকুটীর কাষ্ঠ প্রাচীর ঘুচিয়া, ধীরে ধীরে মণিময় গবাক্ষ, দিব্য মর্ম্মর হর্ম্ম্যরাজি, নীলাম্বর স্পর্শ করিয়াছে। সংযম, কঠোরতা নির্ম্মমতা বিলাসে ব্যসনে ধীরে রূপান্তরিত হইয়াছে। যে বন্দী শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, যে গ্রামান্তের বনবাসী শত্রু দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছিল, সকলেই অভিভূত হইয়া, অনুগত হইয়া এক পরিবারের পরিজনের মত, তাঁহাদের সমষ্টি-দেহের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

আজিকার হিন্দুও সেই পিতৃজাতির সহিত এক। কিন্তু কোন অর্থে? সেদিনকার জাত্যান্বয়ের সহিত কত নব নব যৌবনে বিভিন্ন উপাদান যে আসিয়া মিশিয়াছে, তাহার ত স্থিরতা নাই। তাঁহাদের বেশ, বাস, আকৃতি, আচার্য্য, জীবনোপকরণ কিছুই ত আজ বর্ত্তমানে মিলে না। তবে কোথায়, কোন বনিয়াদের উপর দাঁড়াইয়া, আজিকার হিন্দু সেই পিতৃজাতির সহিত এক?

এই একত্বের বনিয়াদ চেনার উপরই, এই মিলন-সূত্র আবিষ্কারের উপরই, সমাজ মনের স্ফূর্ত্তি নির্ভর করিতেছে। এই যে ঘরের লোকের আপনাকে অবিশ্বাস, পরকে ভয়, সন্দেহ, শক্তিশালী আত্মীয়কে ঈর্ষা, সমস্তই বিদূরিত হইবে, তখন। এতদিন পর্য্যন্ত একটা ক্ষীণ আলোক রশ্মির মত, স্মৃতি, আর একটা স্থূল যুক্তিহীন বোধ, তাহাই আমাদের ছিল। যাহারা এখনও অচলায়তনে চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে, তাহারা এই জন্যই আছে। তাহারা জানে, স্বাতন্ত্র্য আমাদের পথ, ঐ জানাটুকুই তাহাদের সব। ভাবে না—স্বাতন্ত্র্য, কখন কোন অবস্থায় পড়িলে, মানুষের পথ হয়, কেন আমাদের পথ হইয়াছিল, কবে হইয়াছিল? যুগধর্ম্ম, মনকে নাড়া দিয়া, এই সবই ভাবাইয়া একটা নূতন চেতনার সঞ্চার করিয়া দিতেছে। নব-জাগরণ ইহারই জন্য। পুরাতনকে একটা প্রভাবে পড়িয়া জাতি ধরিয়াছিল, সেই মূল প্রভাবই যদি অপসারিত হইয়া থাকে, পুরাতনের প্রভাব কিসের জন্য ও কতক্ষণ?

আমাদের এই হিন্দু সমাজের ইমারত অনেকবার একেবারে ভাঙ্গিয়া, সমভূমি করিয়াই, আবার গড়িয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার কত স্তম্ভ যে কতবার বদলাইয়া লওয়া হইয়াছে, তাহারও হিসাব নাই। তবুও, সে সকল সত্ত্বেও, ভাঙ্গাবাড়ীর সকল উপদ্রবের মধ্যে এবং

পরে সমাজ সমাজই ছিল। মোট কথা এই যে, সমাজ প্রকাশ করিবে ও ধরিয়া রাখিবে, জীবনকে, আর জীবন প্রকাশ করিবে ও ধরিয়া রাখিবে, সত্যকে। আহার, বিহার, জীবিকা, জন্ম, বিবাহ, মৃতের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম, এ সমস্ত জীবনেরই সংক্রান্ত, ইহাদের মধ্য দিয়া জীবন শক্তি বিচ্ছুরিত হয়। যাহাকে প্রাণ বলি, প্রাণই সত্যকে ধরিয়া রাখে। শুধু তাহাই নহে এই প্রাণ ও জাতীয় সত্য উভয়ের মিশ্রণে যে বিচিত্র আলোক জ্বলিয়া উঠে, তাহারই নাম জাতীয়-গরিমা। ভারত যে ভাবে এই আলোকদান একদিন জ্বালাইয়াছিল, সেই ভাবটাই তাহার বৈশিষ্ট্য। ভাবটা আমরা আজ হারাইয়া ফেলিয়াছি। অচলায়তনের মধ্যে রক্ষণ-শীলতা-রূপে একটা দৃঢ়তা, একটা প্রতিজ্ঞা, এখনও বজায় আছে। সে যদি ভাবের সন্ধানে নিযুক্ত হয়, তবেই সে সার্থক। আর যদি অভাবকে আঁকড়িয়া ধরিয়া পড়িয়া থাকাই তাহার প্রতিজ্ঞা হয়, তবে, বিশ্ব-বিধান-সম্মুখে তাহার আজ কোনই উপযোগীতা নাই।

আমাদের আজ অবস্থা কি? প্রাণের সহিত সত্যের সংযোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। জীবনের খণ্ডাংশগুলিকে ছেঁড়া কানির মত বুকে চাপিয়া ধরিয়া আমরা ভাবিতেছিলাম, বৈশিষ্ট্য রক্ষা। বৈশিষ্ট্য, আরো অনেক উচ্চস্তরের কথা,—সে এই এতটুকু বস্তু নহে। ছেঁড়া কানি ফেলিয়া দিয়া, তাহাকেই বুকে তুলিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

শ্রীসত্যবালা দেবী।

আমরা কি চাই? (৩)

[স্বরাজ—কাহার রাজ? বা, কোন্ রাজ?]

১।

যিনি যাহাই বলুন না কেন, দেশের লোকে যে কি চান, ইহা এখনও বলা যায় না। কন্‌গ্রেস স্বরাজের সুর তুলিয়াছেন। তাই স্বরাজ কথাটা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, এই স্বরাজ বস্তুটা যে কি, ইহা অতি অল্প লোকেই এখনও ভাল করিয়া ধরিতে পারিয়াছেন। গ্রামের লোকেরা নাকি, অনেকস্থলেই স্বরাজ কি, এ প্রশ্ন তুলিয়াছেন। বাঙ্গালার প্রাদেশিক-কন্‌গ্রেস কমিটির সহকারী-সম্পাদকের মুখে শুনিয়াছি যে, নানা স্থান হইতে, কন্‌গ্রেসের প্রচারকগণ, এই প্রশ্নের একটা সদুত্তর চাহিয়াছেন।

যদি সত্য সত্যই দেশের লোকে স্বরাজ কি বস্তু ইহা না বুঝেন, তাহা হইলে, এই স্বরাজের নামে তাঁরা এমনভাবে মাতিয়া উঠিতেছেন কেন? ইহার উত্তর সহজ। নানা কারণে, দেশের লোক একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। পেটে অন্ন নাই। গায়ে বস্ত্র নাই। রোগে ঔষধ নাই। পথে ঘাটে ইজ্জত নাই। মানুষ যাহা লইয়া বাঁচিয়া থাকে, যাহাতে জীবন-ধারণ সম্ভব ও সার্থক হয়, তার অভাব পড়িয়া গিয়াছে। এ অভাব কখন্, কিসে দূর হইবে, তারও কোনও পথ দেখা যাইতেছে না। রাষ্ট্রীয় সভাসমিতিতে, বক্তাগণ, আর সংবাদপত্রে লেখকেরা, সকলেই প্রায় একবাক্যে কহিতেছেন যে, আমাদের স্বরাজ নাই বলিয়াই এমন দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

স্বরাজ পাইলেই, এ দুঃখ দুর্গতি ঘুচিয়া যাইবে। সুতরাং, স্বরাজ এমন একটা কিছু, যাহা লাভ হইলে পরে, ক্ষুধার অন্ন, শীতের বস্ত্র, বর্ষার আচ্ছাদন, আর সংসার-পথে ইজ্জত রাখিবার উপায় হইবে। লোকে এইমাত্র বুঝিয়াছে। আর, তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, ইহাই যথেষ্ট। স্বরাজের নামে তাঁহাদের অন্তরে একটা অভিনব আশার সঞ্চার হইতেছে। এই জন্যই তাঁহারা, স্বরাজ যে কি বস্তু, ইহা না বুঝিয়া এবং না জানিয়াও, এই স্বরাজের আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছেন।

দেশের অবস্থা দেখিয়া উপনিষদের একটা কাহিনী মনে পড়ে। বৃহস্পতি একদিন নিজের মনে কহিতেছিলেন যে, এমন একটা বস্তু আছে, যাহা পাইলে পরে, সকল দুঃখ, সকল অভাব ঘুচিয়া যায়, যাহা লাভ হইলে পরে আর বিশ্বে লোভনীয় কিছু থাকে না, সকল কামনার নিবৃত্তি হয়। দেবতারা এবং অসুরেরা উভয়েই একথা শুনিলেন। উভয়েই একথা শুনিয়া, এই অপরূপ বস্তু লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। দেবতারা তখন ইন্দ্রকে ও অসুরেরা বিরোচনকে বৃহস্পতির নিকট পাঠাইয়া, এই বস্তুর সন্ধান লইয়া আসিতে কহিলেন। ইঁহারা এক সঙ্গেই, সাধা-কুশ হাতে লইয়া, ব্রহ্মচারিবেশে বৃহস্পতির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বাদশ বৎসর বৃহস্পতি তাঁহাদের দিকে একটিবারও মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন না। পরে ইঁহাদের নিষ্ঠা দেখিয়া, একদিন ডাকিয়া ইঁহাদের অভিপ্রায় জানিলেন। জানিয়া, বৃহস্পতি কহিলেন, "একটা পাত্রে খানিকটা জল লইয়া আইস"। জলপূর্ণ পাত্র আনিলে, কহিলেন—"চাহিয়া দেখ, ইহাতে কি দেখিতে পাও?" ইন্দ্র ও বিরোচন তাহাই করিলেন; করিয়া, জলের উপরে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখিয়া কহিলেন——"আমরা যেমনটি তেমনটিই দেখিতেছি।" ক্ষৌরাদি করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবসানে, স্নাতক হইয়া, গন্ধমাল্যাদি বিভূষিত বেশে, পরদিবস প্রাতে, পুনরায় ঐ জলপাত্র লইয়া আসিতে কহিলেন। ইন্দ্র ও বিরোচন তাহাই করিলেন। বৃহস্পতি কহিলেন—"চাহিয়া দেখ, কি দেখিতে পাও?" উভয়ে জলের উপরে নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া কহিলেন, "আমরা যেমনটি তেমনটিই দেখিতেছি।"

বৃহস্পতি কহিলেন—"তদ্বৎ। অর্থাৎ, সেই বস্তু ইহাই।

বৃহস্পতির কথা শুনিয়া, ইন্দ্র ও বিরোচন দুজনেই বস্তুলাভ হইল ভাবিয়া, গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। বৃহস্পতি ইঁহাদের অবস্থা দেখিয়া নিজমনে কহিতে লাগিলেন—"হায়! ইঁহারা শব্দ শুনিয়া, বস্তুজ্ঞান না পাইয়াই, বস্তুলাভ হইল ভাবিয়া চলিয়া গেল। ইঁহারা এই শব্দের অনুসরণ করিয়া বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে।" আমাদেরও এই দশাই না ঘটে।

স্বরাজের নামে দেশের লোকে মাতিয়া উঠিয়াছেন, ইহা একদিকে শুভলক্ষণ বটে। কিন্তু এরূপ উৎসাহ, এরূপভাবে, কেবল অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়কে ধরিয়া বেশী দিন টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃত বস্তু আশ্রয় দিয়া, এ উৎসাহ ও আশাকে কেবল বাঁচাইয়া রাখা নয়, কিন্তু যথাযোগ্য কর্ম্মে নিয়োগ না করিতে পারিলে, পরিণাম বিষময় হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী।

হতাশ রোগীর যে অবস্থা, দেশের সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ডাক্তার কবিরাজ জবাব দিলে, রোগমুক্তির যখন আর বড় আশা বুদ্ধি বিবেচনায় মানুষ খুঁজিয়া পায় না, তখন তন্ত্র-মন্ত্র, টোট্‌কা-টুট্‌কা, যে-যা-বলে, তাই আঁকড়াইয়া ধরে। আমাদের লোকেরা তাহাই করিতেছেন।

উকিল মোক্তারেরা যদি নিজেদের ব্যবসায় ছাড়েন, তবেই স্বরাজ পাইব, বা স্বরাজের পথে

অগ্রসর হইব। বস্। অমনি একদল স্বরাজ-সেবক উকিল-মোক্তারদের পিছনে লাগিয়া গেলেন। অনেক উকিল মোক্তারও দেখিলেন যে, দেশের লোকে যখন এমন করিয়া চাহিতেছেন, তখন, কিছুদিনের জন্য, ব্যবসা'টা না হয় নাই বা করা গেল। তারাও ব্যবসা স্থগিত রাখিতে আরম্ভ করিলেন।

ইংরাজের দেওয়া উপাধি ছাড়িলে স্বরাজলাভের পথ প্রশস্ত হইবে। সুতরাং দেশের লোকে উপাধিধারীদের পিছনে লাগিয়া গেলেন। উপাধিধারীদেরও কেহ কেহ উপাধি ছাড়িলেন। যারা ছাড়িলেন না বা ছাড়িতে পারিলেন না, তাঁরা, কোথাও বা একরূপ সমাজচ্যুত, আর দেশের সর্ব্বত্রই লোক-চক্ষে হেয় হইতে আরম্ভ করিলেন।

ইংরাজ সরকারের সংস্পৃষ্ট স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পড়ুয়া বাহির করিয়া আনিতে পারিলেই, এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ-লাভ হইতে পারিবে। সুতরাং, এ চেষ্টাও চারিদিকে হইতে লাগিল। বহু পড়ুয়া স্কুল কলেজ ছাড়িয়া আসিল। অনেকে আসিল, ভাল পড়া হইবে এই লোভে পড়িয়া। কেহ কেহ আসিল, পড়া চুলোয় যাক্, দেশ যাতে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, এমন কাজে জীবন উৎসর্গ করিবার সংকল্প লইয়া।

চরকা কাটিতে শিখিলে ও ঘরে ঘরে চরকা চালাইতে পারিলেই স্বরাজ-লাভ হইবে। একথা শুনিয়া, চারিদিগে 'চরকা' 'চরকা' ডাক পড়িল। ছেলেরা কলম ছাড়িয়া চরকা ধরিল। যে সকল লোক অকর্ম্মণ্য হইয়া, তাস পিটিয়া বা দাবা ঠেলিয়া দিন কাটাইতেছিল, অথবা যাহারা কর্ম্ম-খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেড়াইতেছিল তারা জীবনের একটা লক্ষ্য ও কর্ম্ম পাইল ভাবিয়া, চরকা ঘুরাইতে লাগিল।

তারপর আদেশ হইল—এককোটী লোককে কনগ্রেসের সভ্য করিতে পারিলে, আর এক কোটী টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেই স্বরাজ-লাভ হইবে। অমনি লোকে তার চেষ্টায় লাগিয়া গেল।

কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিল না—এ সকলের একটি বা পাচটি বা সকলগুলিতে মিলিয়া যাহা লাভ হইতে পারে, তাহাকে স্বরাজ বলিব কেন ?

আর এ সামান্য প্রশ্নটা লোকের মনে উঠিল না এইজন্য, যে, তাঁহাদের অনেকেই স্বরাজ বস্তুটা যে কি, ইহা তলাইয়া বুঝিতে ও ধরিতে চেষ্টা করেন নাই। সাধ্য-নির্ণয় হইলে পরে, লোকে স্বভাবতঃই সাধনার সফলতা বা নিষ্ফলতার সম্ভাবনা বিচার করিয়া থাকে। বিচার করিবার অধিকার, তখন তাহাদের জন্মে। যেখানে সাধ্য নির্ণয় হয় নাই, সেখানে লোকে সাধনার বিচার করিবে কি করিয়া, তাহা জানে না ও বুঝিতে পারে না। এখানে চোখ বুজিয়া চলা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে এটি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মপথে যাঁরা একটা নিরবচ্ছিন্ন আরাম, আনন্দ বা শান্তির অন্বেষণে ছুটিয়া হায়রাণ হয়েন, তাঁদের জীবনে এরূপ প্রায়ই ঘটে যে, তাঁরা, প্রাণের জ্বালায়, যে-যা-বলে তাহাই করিতে যান্। ইহাঁদের প্রাণের জ্বালাটা, অনুভবের বস্তু বলিয়া, সত্য। এই জ্বালা নিবারণের ইচ্ছাটা, স্বাভাবিক বলিয়া, অত্যন্ত আন্তরিক সন্দেহ নাই। কিন্তু তারপরে যাহা কিছু সকলই অযৌক্তিক। সকলই হাতুড়িয়া ; অন্ধকারে ঢিলছুড়া। দশটার মধ্যে কখনও বা, আকস্মিক ঘটনাযোগে, একটা লাগিয়া যায়, অধিকাংশ

সময়, কোনটাই বা লাগে না। তবু যে ইহাঁরা যা-শুনেন্ তাই ধরিতে যান, ইহার অর্থ এই যে, ইহাদের প্রাণের জ্বালা বড় বেশী। অত জ্বালা-যন্ত্রণার মাঝখানে কোন্ উপায়টাতে আরামের সম্ভাবনা কতটা, এ সকল বিচারের অবসর ও শক্তি তাঁহাদের থাকে না।

আমাদের বর্ত্তমান "স্বদেশী" বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও তাহাই ঘটিতেছে। লোকের জ্বালা বড় বেশী। অত জ্বালা-যন্ত্রণার মাঝখানে, তাহাদের বিচার-বক্তি করিবার অবস্থাও নয়, অবসরও নাই, প্রবৃত্তিরও অভাব। সুতরাং, যাহা বলা যায়, তাহারা তাই করিতে প্রস্তুত। ত্রিতাপ-জ্বালায় ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি যেমন অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠেন, দেশের জনসাধারণে সেইরূপ নানা দুঃখকষ্টে অধীর ও হতাশ হইয়া, অত্যন্ত শ্রদ্ধালু হইয়া উঠিয়াছেন।

এ অবস্থাটা বড় ভাল। কিন্তু দেশের লোকে যে পরিমাণে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছেন এবং অবিচারে "নেতৃবর্গের" নির্দ্দেশ নিষ্ঠা-সহকারে অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই পরিমাণে এই সকল নেতার দায়িত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। যে, বিচার-বিবেচনা না করিয়া, কোনও দিন আমার উপদেশ বা অনুরোধ গ্রহণ করিবে না জানি, তাহাকে মনে যখন যে খেয়াল আসে, তাহাই বলিতে পারি। আমি যেটা নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়া কষিয়া দিলাম না বা দিতে পারিলাম না, জানি যে, সে তাহা তাহার নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়া খুব করিয়া কষিয়া লইবে। যাহা সত্য, যাহা সম্ভব, যাহা সঙ্গত, তাহাই গ্রহণ করিবে, যাহা মিথ্যা বা সত্যাভাস মাত্র, যাহা অসম্ভব বা অসঙ্গত, তাহা সে আপনিই ছাঁকিয়া, ছাটিয়া ফেলিয়া দিবে। কিন্তু যে আমার কথা বেদ-বাক্যের মতন মানিয়া চলিবে জানি বা বুঝি, তাহাকে এরূপ খাম-খেয়ালি-ভাবে উপদেশ দেওয়া যায় কি? সে যখন আমার কথা কষিয়া দেখিবে না, তখন তাহাকে সে কথা কহিবার আগে, আমাকে ভাল করিয়া কষিয়া দেখিতে হয়। না করিলে—"অন্ধেন নীয়মানা যথান্ধাঃ"—অন্ধ যেমন অন্ধকে চালায়, আমিও তাহাকে সেইরূপই চালাইব না কি?

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই জন্যই একবার একজন ধর্ম্ম প্রচারককে কহিয়াছিলেন—"আমার ভুলভ্রান্তি যাই হউক না কেন,—ঈশ্বরের নিকটে সে জন্য আমি তোমা অপেক্ষা কম শাস্তি পাইব। আমি নিজেই কুপথে চলিয়াছি। তোমরা আরও দশজনকে ভুল পথে চালাইতেছ। তাদের দণ্ডের ভাগীও তোমাদের হইতে হইবে।"

২।

নেতারা যাহাই উপদেশ করিতেছেন, সরলপ্রাণ জনসাধারণ বিনা-বিচারে তাহারই অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া, নেতৃত্বের দায়িত্ব শতগুণ বাড়িয়া পড়িয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্বের বিপদও ঘনাইয়া আসিতেছে। যদি জনসাধারণে ক্রমে ইহা বুঝেন ও দেখেন যে, তাঁহারা যার জন্য, অমন ভাবে নেতাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া, সর্ব্বস্ব-পণ করিয়া ছুটিয়াছিলেন, তাহা পাওয়া গেল না এবং যখন তাঁহারা এটি বুঝিবেন যে, অজ্ঞতা বা অনবধানতা বশতঃ, নেতৃগণ তাঁহাদের বিপথে বা কুপথে চালাইয়া আনিয়াছেন, তখন, কেবল নেতাদেরই নেতৃত্ব যাইবে, তাহা নহে, যে উদ্দেশ্যে তাঁহারা এতটা সময়, শক্তি এবং অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহার উপরে পর্য্যন্ত লোকের অবিশ্বাস জন্মিয়া যাইবে। আবার যে সহজে

দেশহিত-কল্পে এমনভাবে লোকের সহানুভূতি বা সাহায্য পাওয়া যাইবে, এরূপ সম্ভাবনা থাকিবে না।

সকল সাধনাই যে সিদ্ধিলাভ করে তাহা নহে। আমাদের বর্ত্তমান স্বরাজ-সাধনাই যে আমরা যতটা আশু-সিদ্ধির আশা করিতেছি, ততটা সত্বরে সিদ্ধিলাভ করিবে, ইহা না-ও বা হইতে পারে। সিদ্ধিলাভ যে হবে না, এমন ভাবি না। হবে নিশ্চয়, ইহাই বিশ্বাস করি। এবিশ্বাস না থাকিলে সাধনায় নিষ্ঠা সম্ভবে না। তবুও, সিদ্ধি ত আর আমাদের হাতে নয়। সিদ্ধিদাতা, বিধাতা। তাঁর সকল কামনা ও সকল কর্ম্ম বিশ্বতোমুখী, বিশ্বের কল্যাণের সঙ্গে জড়িত। তাঁর বিশ্ব-বিধানে যখন যে সাধনার সিদ্ধিলাভ আবশ্যক হয়, তিনি তখনই তাহাকে সিদ্ধিদান করেন। সুতরাং আমি যতটা শীঘ্র, বা যে আকারে আমার ইষ্টলাভ হউক, চাহিতেছি, বা হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে, ততটা সত্বর বা সেই আকারে যে তাহা লাভ হইবেই, এমন কথা একেবারে ঠিক করিয়া বলা যায় কি ? সুতরাং স্বরাজ-সাধনার সিদ্ধিও বিধাতার হাতে, আমাদের হাতে নয়। তাঁর ইচ্ছা যখন হইবে, তখনই সিদ্ধি পাইব। এখনই যে পাইব, এমন ত কথা নাই।

কিন্তু সিদ্ধিলাভ হউক বা না হউক, সাধকের শ্রদ্ধা যদি "কোমল" শ্রদ্ধা না হয়—অর্থাৎ, এ শ্রদ্ধা যদি শাস্ত্র (অর্থাৎ, অতীতের অভিজ্ঞতা) এবং যুক্তি (অর্থাৎ, মানবচিন্তার নিত্য-সূত্র) সঙ্গত হয় শাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা যদি এই শ্রদ্ধা পরিমার্জ্জিত হইয়া, সাধ্যবস্তু সাধকের অনুভবেতে প্রতিষ্ঠালাভ করে, তাহা হইলে, সিদ্ধিলাভ যতই দূরে যাউক না কেন, সাধন কালে যতই বাধা বিপত্তি উপস্থিত হউক না কেন, তাহাতে শ্রদ্ধাও বিচলিত হয় না, সাধনাও শিথিল হয় না।

কিন্তু সাধক যেখানে যুক্তি-বিচার না করিয়া, কিম্বা যুক্তি-বিচারের অবকাশ না পাইয়া, অথবা যুক্তি-বিচার করিয়া পথ চলিতে গেলে যে কাল বিলম্ব অনিবার্য, কিম্বা শ্রম-স্বীকার আবশ্যক, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, গুরুর অনধিগত-অর্থ উপদেশের অনুসরণ করেন, সেখানে, সম্ভাবিত সিদ্ধিলাভ না হইলে, নিরাশ্বাসের নাস্তিকতা দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়েন। তখন সাধ্য সম্বন্ধে হতাশ্বাস এবং গুরু সম্বন্ধে অনাস্থা জন্মিয়া, তাহার সকল সাধনের মূল পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া দেয়। আমাদের বর্ত্তমান স্বরাজ-সাধনার গুরুগণ এই মোটা কথাটা কি দেখেন না, বা, ভাবিয়া বুঝিবার অবসর পান না ?

৩।

লোকে একটা কিছু চাহিতেছে। লোকের একটা গভীর, দুর্ব্বিসহ অভাব-বোধ হইতেছে। এই অভাবটা কেবল অন্নবস্ত্রের নয়। অন্নবস্ত্রের অনটন ত আছেই, এ অনটন একেবারে নূতনও নয়। এ অনটন যাদের এখনও শূন্যের কোঠায় গিয়া দাঁড়ায় নাই, তারাও একটা যাতনায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। এই একটা কিছু যে কি, সকলের আগে নিজে ইহা পরিষ্কার করিয়া ধরিতে হইবে, পরে জনসাধারণকে ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া, সাধ্য-বস্তুকে তাহাদের চক্ষের উপরে উজ্জ্বলরূপে ধরিতে হইবে। যতদিন না ইহা হইয়াছে, ততদিন এই স্বরাজ-সাধনা সিদ্ধি-পথে কিছুতেই অগ্রসর হইবে না।

পাঞ্জাবের অত্যাচার, খিলাফতের উপরে অবিচার, এই দুইটি বিষয়ের উপরে আমাদের

বর্ত্তমান আন্দোলনকে দাড় করাইবার চেষ্টা হইয়াছে। মুসলমানেরা খিলাফৎ-সমস্যা সকলে বুঝুন্ আর নাই বুঝুন, তাঁদের ধর্ম্মের উপরে একটা গুরুতর আঘাত পড়িয়াছে, ইহা বুঝেন। এই জন্য অনেক মুসলমান খিলাফতের নামে মাতিয়া উঠিয়াছেন। তাঁদের প্রেরণা ধর্ম্মের, স্বাদেশিকতার নহে। একথাটা অস্বীকার করা কঠিন। সুতরাং, মুসলমান-সমাজের সঙ্গে যতই সহানুভূতি করি না কেন, এই প্রেরণার দ্বারা যে আমাদের হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া ভারতের নূতন জাতি গড়িয়া উঠিবে এমন কল্পনা করা যায় না। সাধারণ লোকে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেহই এখনও এই নূতন জাতিটা যে কি, ইহার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য কি, ইহা বুঝেন না। সুতরাং, তাহারা, স্বরাজটাকে যে কি, ইহাও ভাল করিয়া এখনও ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না।

আর এই স্বাদেশিকতার প্রকৃতি এখনও সকলে বুঝেন নাই বলিয়া, স্বরাজ সম্বন্ধে নানা লোকে নানারূপ কল্পনা করিতেছেন। এমন হিন্দু স্বদেশ ভক্তের কথা জানি, যাহারা সত্যই, ভারতের নূতন যুগে, পুনরায় একটা হিন্দু রাজ্যের আশায় বসিয়া আছেন। কবে আবার হিন্দু, সসাগরা ভারতের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইবে ইহারা সেই চিন্তাই করিয়া থাকেন। স্বরাজ বলিতে ইহারা হিন্দুরাজ বুঝেন। এই "স্বরাজ"-রাষ্ট্রপতি হইবেন, হিন্দু। এই স্বরাজ্যে, প্রজা হিন্দু ধর্ম্ম পালন করিবে। হিন্দু রাষ্ট্রে, হিন্দু-সম্রাটের অধীনে, পুনরায় ভারতে "সনাতন" বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, হইবে, আবার হিন্দু-আচার প্রবর্ত্তিত হইবে, হিন্দু সাধনার প্রকট-মূর্ত্তি স্বরূপে, ভারতের সমাজ, বিশ্ব-সমাজে আপনার উচ্চ-আসন অধিকার করিয়া বসিবে।

সেইরূপ, এমন মুসলমানও আছেন, যাহারা মোস্‌লেম-সমাজের লুপ্ত বৈভব, হৃত-গৌরব, নষ্ট-প্রতাপ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার আশায়, ভারতে পুনরায় মুসলমানের রাষ্ট্রীয়-আধিপত্য দেখিতে চাহেন। ইহারা স্বরাজ বলিতে মুসলমান-রাজ বুঝেন। রুম হইতে চীন-সীমান্ত পর্য্যন্ত এখনও মোস্‌লেম-সমাজ বিস্তারিত রহিয়াছে। কিন্তু, এ সকল মোসলেম-রাজ্য দুর্ব্বল ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়া আছে। ভারতবর্ষে যদি আবার একটা মুসলমান প্রভু-শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে, সমগ্র মোস্‌লেম-সমাজকে সখ্য-বদ্ধ করিয়া, একটা বিরাট সর্ব্ব-মোস্‌লেম-সঙ্ঘ বা pan-Islamic federation গড়িয়া তোলা একেবারে অসাধ্য হইবে না। কিছু দিন হইতে আধুনিক শিক্ষা-প্রাপ্ত মুসলমানদিগের অন্তরে এই ভাবটা জাগিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং, ইহাঁরা যে ভারতে একটা মোস্‌লেম-রাজ প্রতিষ্ঠা হউক, এরূপ ইচ্ছা করিবেন, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে। এ সকল মুসলমানই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা মুসলমান আগে, ভারতবাসী পরে—Muslims first, Indians next। অর্থাৎ, মুসলমান-সমাজের সঙ্গে ইহাঁদের সম্বন্ধ, ভারতবর্ষের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তাহার উপরে। এ সকল কথা আমার কল্পিত নহে। স্বদেশী-আন্দোলনের আরম্ভ হইতেই, ভারতের সর্ব্বত্র এমন বহুতর লোকের সঙ্গে আলাপ, পরিচয় এবং আত্মীয়তা জন্মিয়াছে, যাহারা এদেশে আবার একটা হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। ইহা তাঁহাদের নিজেদের মুখেই শুনিয়াছি এবং এই কথা লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে অনেক তর্কবিতর্কও করিয়াছি। আর মুসলমান নেতৃবর্গের কথায় এবং আচরণে, কখনও কখনও বা তাঁহারা প্যান-ইসলামের যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইতেও ইহা বুঝিয়াছি যে, তাঁহাদের

সকলের না হউক, অন্ততঃ অনেকেরই ভারতে স্বরাজ্যের লক্ষ্য, ইংরাজ-রাজ্যের স্থলে, আবার একটা মোস্‌লেম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দেখা।

তারপর, হিন্দু-মুসলমানের কথা ছাড়িয়া, দেশে যে সকল দেশীয় রাজা আছেন, তাঁহাদের দিকে চাহিয়াও এ কথা বলা যায় না যে, "হিন্দুমুসলমান মিলিয়া ভারতে যে নূতন জাতি গড়িয়া উঠিতেছে", তাঁহার প্রকৃতি যাহা, সেই প্রকৃতির অনুযায়ী যেরূপ রাজ, সেই-রূপ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্যই, দেশের এই বর্ত্তমান অশান্তি জাগিয়াছে। এ সকল দেশীয় রাজ্যেও, ইংরাজই প্রকৃত রাজা, দেশীয় রাজারা স্বল্পবিস্তর সাক্ষীগোপাল হইয়া আছেন। স্বরাজ বলিতে ইহারা যদি কিছু বস্তু বুঝেন, তাহা হইলে নিজেদের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছা-তন্ত্র শাসন-শক্তিই বুঝিয়া থাকেন।

সর্ব্বশেষে, ইংরাজ যাহাদের হাত হইতে মোগলের রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া, বর্ত্তমান ব্রিটীশ রাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—পশ্চিমে শিখ ও দক্ষিণে মহারাট্টা—ইহারাও যে একেবারে সে পূর্ব্ব আশা বিস্মৃত হইয়াছেন, তাহাই বা বলি কি করিয়া? সুযোগ পাইলে যে,ইহারা নিজেদের ভাঙ্গা-স্বপ্ন আবার গড়িয়া উঠুক ইহা চাহিবেন না, মানব-প্রকৃতির বিচারে এরূপ বলা যায় না।

আর এ সকল দেখিয়া শুনিয়াই, ধাঁধা লাগে, আমরা যে 'স্বরাজ' 'স্বরাজ" বলিয়া চীৎকার ও আস্ফালন করিতেছি, সে স্বরাজ কার "রাজ"?

সাধ্য নির্ণয় না হইলে, সাধনায় সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা থাকে কি?

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

ডাক।

[গান]

আকাশ যে ঐ ডাকে তোরে
শুন্‌লি নে, শুন্‌লি নে!
বাতাস যে ঐ ডাকে তোরে
শুন্‌লি নে, শুন্‌লি নে!

ঐ যে আলো,—সোনার ধারায়
ঐ যে গো ঐ সাঁঝের তারায়
কাঁপিয়ে আকাশ, ডাকে তোরে
শুন্‌লি নে, শুন্‌লি নে!

ঐ যে গো ঐ সাঁঝের ফুলে
সবুজ পাতায়, নদীর কূলে
সুর উঠেছে, দুলে দুলে,
শুন্‌লি নে, শুন্‌লি নে!

সুন্দর ঐ ডাকে তোরে
বিশ্বভুবন ব্যাকুল করে'—
ওরে বধির, মধুর বীণা
শুন্‌লি নে, শুন্‌লি নে!!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

হিমালয়ের ধ্যান।

(সিমলা হইতে সাত মাইল দূরে, পর্ব্বত শৃঙ্গে লিখিত।)

ওহে গিরিরাজ! তুমি কি ধ্যানে মগ্ন হয়ে বসে আছ? তোমার এই শীতল নিস্তব্ধ অরণ্যে বসে মনে হচ্ছে, সংসারের গরম বাতাস যেন তোমার প্রাণ স্পর্শ করে না। তোমার ঐ পদতলে সমস্ত দেশ 'লু' পবনে ঝলসে যাচ্ছে, তুমি ভ্রূক্ষেপেও তার পানে চেয়ে দেখ না। ঐ তেত্রিশ কোটি নরনারী অন্নহীন, বস্ত্রহীন, সুখহীন, শান্তিহীন হয়ে অন্তর্জ্বালায় জ্বলে মর্‌ছে, কিন্তু হে পর্ব্বত, পদের সে জ্বালা তোমার হিম দেহ ছুঁতে পারে না। দাসত্বের কষাঘাতে দেশ জেগে উঠেছে—নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে মানুষের প্রাণ আলোড়িত হচ্ছে। কিন্তু, হে হিমালয়! সে আলোড়ন তোমার প্রাণকে একটু বিচলিত ক'রে তুলতে পাচ্ছে না। তবে, হে পর্ব্বত সত্য সত্যই কি তুমি পাথরে গড়া? তুমি কি মৃত, জড়? প্রাণহীন বুকহীন, হৃদয়হীন একটা প্রকাণ্ড স্তূপ-বিশেষ? যদি তুমি তাই, তবে প্রকৃতির সুন্দরতম সাজে কেন সেজে গুজে বসে আছ? কোন্ রাজা তোমার মতন সূর্য্যকরে রঞ্জিত বরফের ঐ সোনার মুকুট পরে সিংহাসনে বসে রাজত্ব করে? কার মাথার উপর অনন্ত প্রসারিত নীলিমার রাজ-ছত্র বিস্তারিত? কার গলায় ঐ মনোহর অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লতার হার? যদি তোমার বুক নাই, তবে তোমার বুকের উপর ঐ অসংখ্য প্রাণভরা তরুরাজ উদ্‌গ্রীব হয়ে নির্জ্জনে কেমন করে প্রাণের লীলা দেখাচ্ছে। যদি তুমি পাথর—যদি তোমার মনের ভিতর ভাবের তরঙ্গ খেলে না,—তবে ঐ সাদা রাঙ্গা ফুলগুলো ফুটিয়ে কেন প্রেমের স্ফূর্ত্তি দেখাচ্ছ? হে পর্ব্বত! তুমি কি সত্য সত্যই সহানুভূতি- ও সমবেদনা হীন, নিরেট পাথরের ঢিবি? যদি তাই হও, তবে তোমার নেত্রে অবিরত ঐ নির্ঝরের জল কেন বহিতেছে? নেত্রনীর করুণার মূর্ত্তি ধরে, গঙ্গা যমুনার অবতার হয়ে, আর্য্যাবর্ত্তে কেন প্রবাহিত হচ্ছে, আমাদের মুখে দুমুঠো অন্ন দিয়ে, এখনও আমাদের প্রাণটা'ক হাড়ের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে? কে বলে, তুমি প্রাণ-হীন? কে বলে, তুমি প্রেম-হীন? গঙ্গা যমুনা যার দান, তার কি পাথরের প্রাণ? তুমি দাতা, তোমার দত্ত জল আমাদের দেশ শ্যামল শস্যে পরিপূর্ণ করে। কিন্তু সে শস্য কি আমাদের ভাণ্ডারে থাকে? তা তো সাগরের জলে ভেসে ভেসে বিদেশ যাচ্ছে, আর আমরা বুভুক্ষু, ক্ষুধার জ্বালায়, 'হা অন্ন! হা অন্ন!' করে দ্বারে দ্বারে ফির্‌ছি।

হে রাজন্! তোমার বক্ষে মুখ লুকিয়ে এ অরণ্যে কাঁদিতে এসেছি। এ ক্রন্দন কি তবে অরণ্যের রোদন হবে? ঐ দেখ, সমতল ছেড়ে তোমার এই উচ্চ শৃঙ্গে চড়লাম; কিন্তু দাসত্ব তো ঘুচুল না। এ পাহাড়ে আমরা কুলি, আমরা বাবুর্চ্চি, আমরা খিদ্‌মদ্‌গার। হে পর্ব্বত! হে পর্ব্বত! একবার চক্ষু মেলে দেখ, এ পর্ব্বতে আমাদের স্থান কোথায়? ঐ সুন্দর সুন্দর গৃহগুলিতে কারা বাস করে? আর আমাদের বাসস্থলী কোথায়? ঐ আবর্জ্জনা-পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর নোংরা ক্ষুদ্র কুঠরিগুলিতে। তোমার বুকের উপর আঁকা বাঁকা পথে, কারা বুটাঘাতে পাহাড় বিকম্পিত করে বিচরণ কচ্ছে? আর আমরা তাদের ভীম-

কান্তি দেখে, ভয়ে পথ ছেড়ে এক পাশে সরে দাড়াচ্ছি? হে পর্ব্বত! তুমি কি আমাদের পাহাড়? তোমার কোন্ পাথরখানাকে আমরা আমাদের বলতে পারি? তোমার কোন্ গাছটার একটা ক্ষুদ্র ডালও নোয়াইয়া, আমরা হাত দিয়ে তার একটা ছোট ফুল ধরতে পারি? পিপাসার জল, তাও পরের হাতে। আমাদের প্রভুরা জলাধার খুলে এক ফোঁটা জল না দিলে, এ পাহাড়ে আমরা পিপাসায় মরে যাই। সে জল ফোঁটাও বিনা পয়সায় পাবার যো নাই। তবে, হে হিমালয়! আমরা কি তোমার? তুমি কি আমাদের? তোমার বুকে কাঁদিতে এলাম। কিন্তু প্রাণ খুলে, মুখ খুলে, মুক্ত কণ্ঠে কাঁদিবারও অধিকার নাই। ঐ উপরে সাহেবের বাংলো, শব্দ গেলে এখনি বন্দুকের শব্দ হতে পারে। হে পর্ব্বত! যদি তুমি আমাদের নও—যদি তোমার সঙ্গে আমাদের পর পর ভাব, তবে আমাদের দেশের মাথার উপর এত বড় স্থান জুড়ে কেন বসে আছ? এক সময় তুমি প্রাচীরের স্থায়, দুর্গের স্থায়, আমাদের রক্ষা করিতে। তোমার সে দুর্গত্ব গত হয়েছে। তবে আমাদের মাথার উপর ভেঙ্গে পড় না কেন? এই হতভাগ্য জাতিকে তোমার পাথরের কবরে চিরতরে কবরিত কর না কেন? আমাদের অস্তিত্বে কি লাভ! অনস্তিত্বই সুখ, অনস্তিত্বই শান্তি!

তোমার এই তপোবন শূন্য পড়ে আছে। এ বনে আর ঋষিগণ তপ করেন না। এ বন এখন শ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গীদের 'পিক্‌নিকের' স্থান হয়েছে। ঋষিদের আশ্রম, অতীতের উপকথা হয়ে পড়েছে। সে সকলের স্থলে, হোটেল, থিয়েটার, সিনেমা, নাচ-ঘর বুক ফুলিয়ে বিরাজ কচ্ছে। হে হিমালয়! তুমি পবিত্রতার পুণ্য-তীর্থ ছিলে। সে তীর্থে এখন মেয়ে পুরুষ, নৃত্য-গীতে রাত্রি কাটাচ্ছে। হে হিমালয়! হে পুণ্যালয়! পুণ্য কোথায়? প্রাণ পুণ্য চায়, কিন্তু, হেথায় যে পাপের পিশাচ-মূর্ত্তি! হে হিমালয়! পাথরের বুক খোলো ও এই হতভাগ্য পথ-ভোলা পথিককে ঐ বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখ।

"চাই না সভ্যতা, চাষা হয়ে থাকি,
দাও ধর্ম্ম-ধন, প্রাণে পূরে রাখি।"

হে ধর্ম্মের আলয়! যে ধ্যানে তুমি মগ্ন, ঐ ধ্যানের একটু আভাষ দাও। তোমার বুকে পিশাচের নৃত্য হইলেও, তুমি তাহা চোখ মেলে দেখ না। হে গিরিবর! তোমার ঐ মহা ধৈর্য্যের এক কণা দান কর। হে ঋষি! তোমার চরণে বসে ধৈর্য্য-মন্ত্রে দীক্ষিত হ'তে চাই। হে অচল! এই অশান্ত মনটাকে শান্ত করে, তোমার মত অটল কর। তুমি যাঁর দর্শন পেয়ে চুপ করে রূপ দেখ্‌ছ, হে মহারূপিন্! তোমার এই সুন্দর অরণ্যে একবার তাঁর রূপে মুগ্ধ কর।

যওষধিষু যো বনস্পতিষু

আজ এই অসংখ্য বনস্পতির অন্তরালে কে তুমি লুকিয়ে আছ, একবার তোমার অনন্ত রূপ দেখাও। এ সান্ত প্রাণ অনন্তে ডুবে যাক্। হিমালয়ের গাছ, হিমালয়ের পাথর পর্য্যন্ত অনন্তের ধ্যান কচ্ছে, তারা ভাষাহীন ভাষায় অনন্তের সুসমাচার প্রচার কচ্ছে। হে ক্ষুদ্র

প্রাণ। তুমি কেন ঐ অনন্তে ডুবে যাও না? দেশের প্রাণ অশান্ত—দেশের প্রাণ উদ্বেলিত। দেশ কি চায়, পায় না?

যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি

দাস হই, গোলাম হই, গরীব হই, ভূমা ভারতের সম্পত্তি। এই হিমালয়ের অরণ্যে সেই ভূমা, ভূমা মহিতে স্মৃর্ত্তিমান্। ওবে তপ্ত প্রাণ। ঐ ভূমার ধ্যান কর। ওহে দেশবাসী নরনারীগণ। তোমরা ঐ ভূমার ধ্যান কর। ভারতের শীর্ষে হিমালয় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ কচ্ছে, ভূমা-মন্ত্রে দীক্ষিত হও। নাল্পে সুখমস্তি। কেন বৃথা চেঁচামেচি? শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

দীন-উপায়ন।

[দেশ-বন্ধু চিত্ত-দম্পতির করকমলে]

শক্তিসহ, শক্তিমন্ত, দাড়াও সম্মুখে।
ছিলে তুমি ব্যবহার-তত্ত্ব শিরোমণি—
উঠেছিলে বৈষয়িক শৈল শির' পরে।
লালু, মনু, উমেশের প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে,
দম্ভের মণিময়মালা খচিত মুকুট
ছিল শীর্ষ অলঙ্কার, আমিত্ব তোমার
জগতেরে দেখাইত আত্ম গরিমায়।
নারদের বীণাচোরা, গুর্জ্জর ভূষণ
কি রাগিণী আলাপি।— খসিল মুকুট—
খসিল সে গরবের গৌরবের মণি
আত্ম-অনুরক্তি হল শতধা চূর্ণিত,
পর্য্যু সিত হল দম্ভ বৈষ্ণব বিনয়ে।
পরাইল দিব্যাঞ্জন নবীন গৌতম
তাই আজি দেখিতেছ, দিব্য আঁখি মেলি,
জল নয়—জল নয়—ও যে মরীচিকা।
ও নহে মঙ্গল-রাখি—সাপের বন্ধন,
ও নহে জীবনী-শক্তি নেশার আবেশ।
জাগাও, প্রবুদ্ধ কর, হে ত্যাগী মহান্,
বন্ধন মোচন কর, দেও সান্দ্র প্রাণ
পরমুখাপেক্ষী আজি ভারত-সন্তান।

হরিয়াছে তস্করতা শিল্পির তুলিকা,
পণ্য বিথিকায় নাই স্বদেশ-গরিমা,
রক্তে মাংসে বিজড়িত—দাসত্ব জড়িমা,
আর্জ্জব নাহিক প্রাণে, সত্যে নিষ্ঠা নাই,
পৌরুষের মেরুদণ্ড—বেদের প্রণব
উচ্চারিয়া কা'র আর শিহরে বিগ্রহ?
কি দিয়াছে—কি দিয়াছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা?
বিলাসেতে প্রবণতা, ব্যক্তিত্বে সংশয়,
রক্ত-পিপাসুর পদ করিতে ক্ষালন
অর্দ্ধ-ভুক্ত কৃষকের শ্রম-জল দিয়া।
অস্ত্র-শূন্য গৃহস্থলী—পাছে পশু-বল
পশ্চিমের মত উঠে করিয়া গর্জ্জন
মাখিতে পরের রক্ত, করিতে লুণ্ঠন
ধর্ম্ম-ধ্বজী শাসকের—ন্যায়ের মন্দির।
এসো কর্ম্মি, এসো ত্যাগী, নিত্যানন্দ-প্রাণ,
দেও ঢেলে মা'র ভক্তি—উঠুক্ জাগিয়া
মোহ মদিরায় যারা আছে অচেতন।
ওই শোন, দূরে বাজে নারদের বীণা;
সত্য আজ অনৃতের ছিড়িয়া কর্পট,
আপনার জ্যোতি লয়ে হবে বহির্গত।

রাহুগ্রস্ত শশিবৎ ওই অত্যাচার
হয়েছে পাণ্ডুর কায়—নিষ্প্রভা-মণ্ডিত।
নহেক ভারত-ভূমি শৌণ্ডিক-আলয়—
নহে ইহা বিলাসের রম্য উপবন,
আত্ম-সুখ-স্পৃহা হেথা করে না অটন—
যুবতীর যৌবনের রূপ পরখিয়া।
এখনো সে সাম-গাথা, ঋষির ওঙ্কার
শ্রুতিমূলে প্রবেশিয়া রচে বিচিত্রতা।
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮।

প্রতিবেশী হজরৎ মেকনের বাণী
এখনো প্রত্যাসে নিত্য রণিয়া রণিয়া
মোসলেম ভ্রাতৃবর্গে করে ধর্ম্ম-প্রাণ।
হে অতিথি, কর্ম্মী তুমি—নব-কহিনুর,
ভক্তি পুষ্পে যতি, তোমা করি বিশোভিত
জাগাইয়া দেও, দেব! নিদ্রিত ভারত।

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

শিব-শক্তি ও গায়ত্রী।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের যাহারা দ্বিজ এবং সনাতন ধর্ম্মে বিশ্বাস রাখেন, তাঁহারা সকলেই শাক্ত, অর্থাৎ, শক্তির উপাসক। তাঁহাদের যখন উপনয়ন হয়, তখন তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম আমরা স্বীকার করি, সেই জন্যই তাঁহারা দ্বিজ। তখনই তাঁহাদের সাধনার প্রারম্ভ, ইংরাজী কথায়—spiritual birth সেই সাধনার মূল-মন্ত্র, গায়ত্রী। গায়ত্রী ত্রিধা। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মাণী, তিনি সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার শক্তি। তিনি বিষ্ণু-শক্তি, জগৎ-পালক বিষ্ণুর শক্তি। তিনি রুদ্রাণী, সংহার-কর্ত্তা রুদ্রের শক্তি। এই তিন শক্তির যাঁহারা সাধনা করেন, তাঁহারা দ্বিজ; এবং শক্তি-উপাসক বলিয়া, তাঁহারা শাক্ত।

এখন দেখা যাক, তাঁহাদের উপাসনাই বা কি এবং গায়ত্রী-মন্ত্রের বাচ্য-শক্তি এবং বাচক-শক্তিই বা কি? মন্ত্র-বিদ্যা সম্বন্ধে বিশদভাবে বলিবার সময় অদ্য হইবে না। তথাপি গায়ত্রী মন্ত্রটীর কি উদ্দেশ্য, এবং তৎ-সাধনার কি ফল, সেটা স্থূলতঃ বলা, মন্ত্র-বিদ্যার উপক্রমণিকা বলিয়া গ্রহণ করিলে বাধিত হইবে। যাহাতে আমরা বাহ্য-জগত অথবা সংসার বলি, তাহাতে আমরা কি দেখিতে পাই?—জন্ম, স্থিতি, প্রলয়। এই জন্ম স্থিতি প্রলয় অনুক্ষণ হইতেছে। ইহারই ধারাকে আমরা সংসার বলি। গচ্ছতীতি জগৎ, সংসরতীতি সংসারঃ।

যেমন বাহ্য জগতে জন্ম-স্থিতি-প্রলয়, সেই প্রকার অনুক্ষণ অন্তর্জগতেও জন্ম স্থিতি-প্রলয় ঘটিতেছে। এই অন্তর্জগতের, জন্মের বাচক, 'আ'কার। এই অন্তর্জগতের স্থিতি-বাচক হইতেছে, 'ই' কার। এই অন্তর্জগতের লয়-বাচক হইতেছে, 'উ'-কার। ইংরাজীভাষায়, life, whether external or internal, is a series of pulsation। পণ্ডিত হাক্সলি সাহেব সেইজন্য বলিয়াছেন,—'Life is pulsation'। 'অ,' 'ই,' 'উ' তিনই মাতৃকা-শক্তি। 'অ,' জন্মবাচক; 'ই,' স্থিতিবাচক, 'উ,'প্রলয়বাচক। কিন্তু, এই যে জন্মস্থিতিপ্রলয়, যদি একবার জন্ম, সেই জন্ম-গঠিত বস্তুর স্থিতি এবং সেই বস্তুর প্রলয় হইত, এবং পুনরায় জন্মস্থিতিপ্রলয় না হইত, তাহা হইলে 'অ,' 'ই,' 'উ' পূর্ণরূপে জগৎ-বাচক হইতে পারিত। কিন্তু আমরা

প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, এই জন্য স্থিতি প্রলয় পুনঃ পুনঃ হইতেছে। অতএব এই তিনকে একত্র করা আবশ্যক। এই তিনকে একত্র করিলে, 'ও'কার পাইলাম। কিন্তু এখনও বাহ্যজগৎ কি অন্তর্জগৎ পরিপূর্ণ করিতে পারি নাই। সেই পরিপূর্ত্তির জন্য, নাদ-বিন্দুর আবশ্যক। এই নাদ-বিন্দু 'ও'-কারে যুক্ত হইলে, 'ওঁ'কার পাইলাম। ইহাই দ্বিজদিগের প্রণব। এই প্রণব, ব্রহ্মের প্রতীক। এই প্রণব, ব্রহ্ম-বাচক। এই প্রণব ব্রহ্মোপাসনার মূল-মন্ত্র। সেই জন্য শাস্ত্রে কথিত আছে,—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম ॥

আমাদের মন্ত্র, মননের জন্য, চিন্তার জন্য, অল্প কথায়, বহু বিষয় চিন্তা করিবার সঙ্কেত। যেমন, 'মাধ্যাকর্ষণী শক্তি' কথাটি, সেই শক্তির বহুক্রিয়ার বাচক, সেই প্রকার মন্ত্র, বহু বিষয়ের বাচক, পরিচায়ক, চিন্তার আধার।

এখন দেখা যাক্, গায়ত্রী মন্ত্র কি বস্তুর বাচক। সেই মহা-মন্ত্র ত' সকল দ্বিজই জানেন। সেটা এই—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ ॥

এই মন্ত্র কি বলিতেছে এখন দেখা যাক। ইহার প্রথমেই প্রণব। সেই প্রণব পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্ম বাচক, in which everything lives and moves and has its being তারপর ভূঃ ভুবঃ স্বঃ অর্থাৎ, ভূলোক, ভুবর্লোক অর্থাৎ অন্তরীক্ষ, এবং স্বরলোক অর্থাৎ স্বর্গলোক। এখন এই 'লোক' কথাটার অর্থ বোঝা প্রয়োজন। এটা কোন বিশেষ স্থান নহে, এটা অবস্থার পরিচায়ক। অর্থাৎ, stage of existence of manifestation। মন্ত্রেতে তিনটা লোকের কথা বলিলেন বটে, সেই তিনটা লোক কিন্তু উপলক্ষণ মাত্র। এই তিনটা হইতে বুঝিতে হইবে, সকল 'লোকে'র-ই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে এবং তাহাদেরই চিন্তা করিতে হইবে। বিশেষতঃ, সপ্তলোকের কথা চিন্তা করিতে হইবে। সেই সপ্ত-'লোক' কোথায় পাইতেছি? সে সপ্তলোক গায়ত্রীর ব্যাহৃতিতে পাইতেছি। তদ্যথা—ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুর্ব্বঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং। এই সপ্ত-লোক সপ্তাবস্থার পরিচায়ক। ইহার সঙ্গে পঞ্চ কোষের যে সম্বন্ধ, সেটা লিখিবার সময় হইবে না, পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। তাহা হইলে হইল এই, প্রথমত ব্রহ্মের চিন্তা, তৎপরে সপ্তলোকের চিন্তা। সেই সপ্ত-লোক কোথা হইতে আসিল? তাহারা ব্রহ্ম হইতে প্রসূত হইল। তাহারা ব্রহ্ম-শক্তি হইতে উদ্ভূত। সেই জন্য, 'তৎসবিতুঃ' অর্থাৎ সেই সপ্তলোকের প্রসব কারণের। আর সেই প্রসব কারণটি কিপ্রকার?—সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যশালী। তাঁহার 'বরেণ্যং' (পূজনীয়ং) পূজার জন্য, 'দেবস্য', 'ভর্গঃ,'(তেজঃ, শক্তিঃ) 'ধীমহি,'(চিন্তয়াম), আমরা চিন্তা করিতেছি, ধ্যান করিতেছি, যে ভর্গঃ, 'নঃ' (অস্মাকং) 'ধিয়োয়ঃ' (বুদ্ধীঃ) 'প্রচোদয়াৎ' (প্রেরয়েৎ) —যে শক্তি আমাদিগকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে আমাদিগকে অনুযুক্ত

করিতেছেন। সর্ব্বলোক প্রসবিতা, সর্ব্বব্যাপী, সেই পূর্ণ-মঙ্গল পরম দেবতার জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। এখনও কিন্তু গায়ত্রী সম্পূর্ণ হইল না। পুনর্ব্বার প্রণব উচ্চারণ করিতে হইবে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যখন মোক্ষ হইবে, তখন আবার সেই ব্রহ্মেই লীন হইতে হইবে। অতএব, সোজা কথায়,—সেই জগৎকর্ত্তা, জগৎপাতা, জগৎসংহর্ত্তা, যাঁহা হইতে সমস্ত লোক উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার মহাশক্তি আমরা চিন্তা করিতেছি। সেই মহাশক্তি আমাদিগকে সম্যক অনুভূতি দিবেন, যাহাতে আবার সেই শান্তিময় নিকেতনে, ব্রহ্মেতে পুনরায় লীন হইতে পারি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গায়ত্রী, ব্রহ্মার শক্তি, বিষ্ণুর শক্তি এবং রুদ্রের শক্তি। তাহার উদ্দেশ্য এই, আমাদের ত্রি-সন্ধ্যায়, সময় অনুসারে, প্রাতঃকালে তিনি ব্রহ্মাণী, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুশক্তি এবং সায়াহ্নে তিনি রুদ্রাণী। প্রাতঃকালে, জগতের সৃষ্টি বিষয়েই বিশেষ চিন্তা। মধ্যাহ্নে, জগতের পালন বিষয়েই বিশেষ চিন্তা। এবং সায়াহ্নে, নাশ সম্বন্ধেই বিশেষ চিন্তা।

অতএব, দ্বিজমাত্রই, জন্মতঃ, শক্তির উপাসক, শাক্ত।

শ্রীব্যোমকেশ শর্ম্মা-চক্রবর্ত্তী।

ভূদেব স্মৃতি-পূজা।

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয়কে আমি ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া মনে করি। ইহাতে মতভেদ থাকিতে পারে। কেন না, 'ভিন্ন রুচি র্হি লোকঃ'। তবে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী স্বীয় সমাজ-বৎসল দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই আশা করি আমার সঙ্গে এক মতাবলম্বী হইবেন। আকৃতি প্রকৃতিতে, কাজে কর্ম্মে, সমস্ত বিষয়েই তিনি অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। ভূদেব বাবু দেখিতে এক জন অতি 'সুপুরুষ' ছিলেন। তাঁহার শরীরের গঠন সৌষ্ঠব এবং বল-বত্তা দেখিয়া তাঁহার এক জন সহপাঠী নাকি বলিয়াছিলেন—'ভাই, তোমার শরীরটা দেখিলে আমার হিংসা হয়।' উত্তরে ভূদেব বলিয়াছিলেন—'এই প্রশংসাটুকুতে আমার কিছুই দাবী নাই, ইহাতে আমার জনক জননীরই প্রশংসা করা হইল। তুমি এই কথাতেই, তাঁহারা যে সদাচার-সম্পন্ন ছিলেন, ইহা প্রমাণ করিলে। কেন না 'আচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ"—মাতা পিতা সদাচার পালন করিলেই, অভিপ্সিত সন্তান সন্ততি জন্মিয়া থাকে।" বস্তুতঃই, তাঁহার জনক ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় এক জন ঋষিকল্প ব্যক্তি ছিলেন, যেমন পণ্ডিত, তেমন বিচক্ষণ ছিলেন। "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্য-লক্ষণম্"। বাঙ্গালাতেও বলে, স্ত্রী পুত্র জল, তিনই কর্ম্মের ফল। তাঁহারই তপস্যার ফলে, ভূদেবের ন্যায় পুত্ররত্ন লাভ হইয়াছিল। এদিকে, ভূদেবও ভাগ্যবান্, যে এইরূপ পিতা পাইয়াছিলেন—শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে। ফলতঃ, সৎ পিতা ও সৎ পুত্র, উভয়েরই পরস্পরের সুকৃতির পরিণাম।

ভূদেবের পিতৃদেবের বিচক্ষণতা সম্বন্ধে একটি কাহিনী বলিব। ইহাতে আমরাও কিঞ্চিৎ

শিক্ষা-লাভ করিব। সকলেই বোধ হয় জানেন যে, হিন্দু কলেজের প্রথম অবস্থায়, যখন ছাত্রেরা ইংরেজী শিক্ষা পাইতে আরম্ভ করিল, তখন মদ খাইয়া ও নিষিদ্ধ-মাংস ভোজন করিয়া, ইহারা অর্জ্জিত বিদ্যার সার্থকতা প্রদর্শন করিতেন। এইরূপ সামাজিক ব্যভিচার তাঁরা যে চুপে চাপে করিতেন, তা নয়। মদ খাইয়া রাস্তায় দাড়াইয়া, চীৎকার পূর্ব্বক বলা চাই—'আমি মদ খাইয়াছি'। নিষিদ্ধ-মাংস খাইয়া, হাড়গুলি প্রতিবেশী হিন্দুর বাড়ীতে ফেলা চাই। ইহারই নাম ছিল, সৎ-সাহস। এই সময়েই ধর্ম্ম-বিশ্বাসী, প্রাচীনদের নাম হয় -"ওল্ড্ ফুল্।" সে যাহা হউক, ভূদেবের সহাধ্যায়ীদের মধ্যে কেহই, এই স্রোতের বেগ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। পারিয়াছিলেন কেবল তিনিই এবং তাহাও তদীয় পিতৃদেবের বিচক্ষণতার গুণে। সেই কথাটাই বলিতেছি।

ভূদেবের উপর গৃহ-দেবতার সায়ন্তন আরতির ভার ছিল। তিনি তাহা করেন নাই। পিতা রাত্রিতে বাড়ী আসিয়া আরতি হয় নাই জানিয়া, স্বয়ং তাহা করিলেন। সেই রাত্রিতে কিছুই না বলিয়া, পরদিন পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রে ঠাকুরের আরতি হয় নাই কেন?" পুত্র উত্তর করিলেন "উহা পৌত্তলিকতা।" ঐরূপ অপ্রত্যাশিত উত্তরেও, পিতা পুত্রকে কোনও রূপ তিরস্কার করিলেন না। কেবল বলিলেন, "বিশ্বাস না হয় করিও না, ভক্তি ব্যতীত অশুচি মনে, ঠাকুর ঘরে যাইতে নাই, তুমি আরতি না করিয়া ভালই করিয়াছ। ঠাকুর দেবতার সঙ্গে কপটতা চলে না। এরূপ মন কিন্তু তোমার বেশীদিন থাকিবে না।" অতঃপর পিতা ব্যবস্থা করিলেন, ভোরে উঠিয়া পিতা পুত্রে গঙ্গা স্নানে যাইবেন, রাস্তায় কথা-বার্ত্তা চলিবে।

পুত্র ভাবিয়াছিলেন, নূতন মতের জন্য উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়, তাহার জন্য প্রস্তুতই ছিলেন। দেখিলেন, ওরূপ কোনও কিছুই হইল না। পুত্রের মনে কথাটা লাগিয়া গেল—"বিশ্বাস না হইলে, করিও না"। এরূপ উদার কথা তো মিসনারীরাও বলেন না। ঋষি-কল্প অগাধ শাস্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্ন পিতা, এমন উদারমতি হইয়াও, দেবদেবীর অর্চ্চনা, ভক্তি সহকারে সর্ব্বদা করিয়া থাকেন। স্ব-ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে, এরূপ পিতার মনে আঘাত দেওয়া হইবে। এই ভাবিতে ভাবিতে পুত্রের চক্ষে জল আসিল। তখন সেণ্ট্ পলের উক্তি স্মরণ হইল—"পিতা মাতার উদ্ধার সাধনের জন্য আমি নরকে যাইতেও প্রস্তুত আছি।"

যাহা হউক, পরদিন হইতে নিয়মিত গঙ্গাস্নান আরম্ভ হইল। পিতাপুত্রে নানা বিষয় কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ধর্ম্ম-বিষয় কোনও কথাই হইত না। এইরূপ কিছুদিন গত হইলে পর, এক দিন পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কৃষ্ণ বন্দ্যো'র (রেভারেণ্ড কে, এম, ব্যানার্জি) সঙ্গে একত্র বসিয়া অখাদ্য খাইয়াছ, লোকে বলিতেছে; একথা কি সত্য।" দেখুন পিতা, কত বড় অপবাদটা এতদিন চাপিয়া রাখিয়াছিলেন! পুত্র উত্তর করিলেন—"না আমি খাই নাই, যে খাদ্য আপনার সম্মুখে বসিয়া খাইতে পারিব না, আমি তাহা কদাপি খাইব না।" এই হইয়া গেল, গঙ্গা-স্নান মাহাত্ম্যে তথা সং পিতার বিচক্ষণতায়, ভূদেবের বিকার কাটিয়া গেল। আমরা আজ 'পুষ্পাঞ্জলি'

'পারিবারিক প্রবন্ধ, 'আচার প্রবন্ধ,' 'সামাজিক প্রবন্ধ,' 'বিবিধ প্রবন্ধ,' ইত্যাদি পাইলাম। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ 'বিশ্বনাথ বৃত্তি', 'ভূদেব-বৃত্তি' পাইলেন।

একটি বিপরীত দৃষ্টান্ত না দিলে, এই ব্যাপারের গুরুত্ব বোঝা যাইবে না। এখানেও, পিতা, সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ, পুত্র, ইংরেজিতে কৃতবিদ্য হইতেছেন। পিতা শুনিলেন, পুত্রের ধর্ম্মালোচনার দিকে ঝোঁক হইয়াছে এবং সংস্কারক দলের লোকদের সঙ্গে মেলামেশা হইতেছে। তখন পুত্রের নিকটে পিতা, সংস্কৃত নাস্তিক দর্শনের রীতি অবলম্বনে, নাস্তিকতা প্রচার করিয়া বলিয়াছিলেন,—বিদ্যাসাগর মহাশয় আস্তিক নহেন, 'ইত্যাদি'। বুদ্ধিমান্ পুত্রের নিকটে ইহার ফল যাহা হইল, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি পিতা এবং পৈত্রিক ধর্ম্মশাস্ত্র, উভয়েরই উপর বীতশ্রদ্ধ হইলেন। মার্কিন পণ্ডিত থিয়োডোর পার্কারের ভক্ত হইয়া পড়িলেন এবং ব্রাহ্মসমাজে আগ্রহে যোগদান করিলেন। অতঃপর, পুত্র বাড়ীতে আসিলেন, আর ঠাকুর-পূজা করিব না, এই দৃঢ় সংকল্প লইয়া। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া, ঠাকুর ঘরে পাঠাইবার জন্য লাঠি ধরিলেন। পুত্র অটল রহিলেন। অবশেষে, পিতাই হার মানিলেন। পুত্রকে আর কদাপি ঠাকুর পূজা করিতে হইল না।

এই পুত্রই সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়। এই বিবরণ তদীয় 'আত্মচরিত' হইতে সংগৃহীত। আমরা যে পণ্ডিত শিবনাথকে হারাইলাম, কেবল তাহাই নহে, পণ্ডিত শিবনাথ ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া, সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজের, মূর্ত্তিপূজা, বর্ণবিচার, ইত্যাদি ব্যাপারের ঘোরতর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'যুগান্তর' উপন্যাসে একটি আদর্শ ব্রাহ্মণ পরিবারের অতি সুন্দর চিত্র রহিয়াছে, ঐ পরিবারের কর্ত্তার নাম 'বিশ্বনাথ তর্কভূষণ'।

এই পিতা-পুত্র-সংবাদ একটু ইচ্ছা করিয়াই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইল। আজ আমাদের অনেকের গৃহেই পিতা পুত্রে বিসংবাদের কারণ ঘটিয়াছে। ছেলেরা উপদেশ পাইতেছে, ষোল বৎসর বয়সের অধিক হইলেই, আর পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকের অপেক্ষা করিবে না। আপন বিবেক-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়াই চলিবে। হে ভূদেব, স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ কর, যেন, আমাদের এই সমাজ, তোমার আদর্শ ও উপদেশ অনুসারে কল্যাণের পথে পরিচালিত হয়।

ভূদেবের মাতাঠাকুরাণীও পরমাসাধ্বী ছিলেন। একদিন ছেলে পিতার পাদুকা পায়ে দিয়াছিল। মাতা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "ওরে করেছিস্ কি? এতে যে অধর্ম্ম ও অকল্যাণ হইবে।" তিনি স্বয়ং পতির উদ্দেশে বারংবার প্রণাম করিলেন এবং ঐ পাদুকা পুত্রকে মাথায় করিয়া বহাইয়া অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন। সাধে কি ভূদেব এমন পিতৃমাতৃ ভক্ত হইয়াছিলেন।

বিদ্যা বিষয়েও ভূদেব ছাত্রাবস্থায়ই সমপাঠীদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। যখন শিক্ষকতা করেন, তখন তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক রূপে সমাদৃত হইয়াছিলেন। অনেকে সুবহু বিদ্যার্জ্জন করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ঐ বিদ্যার ফল লোক-সাধারণের ভোগে আসে না। যদি শিক্ষকতাও করেন, তথাপি, স্বীয় ছাত্র ভিন্ন, অপরে তাঁহাদের কাছে কোনও উপকার প্রাপ্ত হন না। ভূদেব যেমন স্বোপার্জ্জিত প্রভূত

ধন পরোপকারার্থে নিয়োগ করিয়াছেন, সেইরূপ অগাধ বিদ্যাও সাধারণের উপকারার্থে প্রচারিত করিয়াছেন। তাহার অক্লান্ত লেখনী বঙ্গভাষায় অনেক অভাব পূরণ করিয়াছে। ইংলণ্ডের ইতিহাস, পুরাবৃত্ত সার (অর্থাৎ প্রাচীন মিসর, গ্রীস্, ইতাদির ইতিবৃত্ত) শিক্ষা বিষয়ের প্রস্তাব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রভৃতি শ্রেণীর গ্রন্থ। তাঁহার পারিবারিক, সামাজিক, আচার, প্রবন্ধাবলী, পুষ্পাঞ্জলি, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থরাজি বাস্তবিকই অমূল্য। প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্য পাঠ্য পাশ্চাত্য-মোহ-ক্লিষ্ট হিন্দুর পক্ষে এগুলি ভেষজ-স্বরূপ। সাহিত্যের হিসাবেও এগুলি এত উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থাবলী যে যখন সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটে কতিপয় সাহিত্যসেবী গিয়া, তাঁহাকে পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণার্থে অনুরোধ করেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"ভূদেব বাবু জীবিত থাকিতে, আমি এই পদ গ্রহণ করিতে পারিব না।"

সাংসারিক পদ পদার্থ সম্বন্ধেও তিনি পরম সৌভাগ্যবান্ ছিলেন। ৫০৲ টাকা বেতনে তিনি কলিকাতা মাদ্রাসায় দ্বিতীয় শিক্ষক রূপে সরকারী কার্য্যে প্রবেশ লাভ করেন। আর যখন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন তিনি ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মচারী, বেতন ১৫০০৲ টাকা। তখন ক্রফ্ট্ সাহেব ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি তিন মাসের বিদায় জন্য আবেদন করিলে গবর্ণমেণ্ট ভূদেব বাবুকেই উক্ত পদে একৃটিনির জন্য মনোনীত করেন। সাহেব মহলে—অর্থাৎ ইউরোপীয় ইন্স্পেক্টার, প্রিনসিপাল্, প্রফেসারগণের মধ্যে—হুলস্থূল পড়িয়া যায়। তাঁহারা কোনও ক্রমেই ক্রফ্ট্ সাহেবকে সেবার বিদায়ে যাইতে দিলেন না।

এত উচ্চপদস্থ হইয়াও, তিনি সাহেব সুবার সঙ্গেই 'খানা খাওয়া' দূরে থাকুক, ইংরেজী কায়দায় পোষাকও পরিতেন না। অথচ, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি, বিচার শক্তি প্রভৃতির দ্বারা, উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ সতত সন্তুষ্ট ছিলেন। শুনিয়াছি, ক্রফ্ট্ সাহেব, তাঁহার পরামর্শ না নিয়া, কোনও কাজই করিতেন না। বড় বড় সুকঠিন রিপোর্ট, তাহার দ্বারাই লিখিত হইত। এদিকে দেশের উপকারের কোনও সূত্র পাইলে, ভূদেব তাহা কদাপি পরিহার করেন নাই। বিহারে আরবি অক্ষরে উর্দ্দুর প্রচলন ছিল। তাঁহারই প্রযত্নে ঐ প্রদেশে কায়েথি অক্ষরে হিন্দীর প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এ ছাড়া, তিনি অনেক নূতন পুস্তক হিন্দীতে প্রণয়ন করাইয়া, হিন্দী-সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ বিহার-বাসিগণ তাহার স্মৃতি-কল্পে "ভূদেব হিন্দী মেডেল্ ফণ্ড্" সংস্থাপন করিয়াছেন। যে ছাত্র মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় হিন্দী-রচনায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে, তাহাকে একটি রৌপ্য পদক এবং হিন্দী পুস্তক পুরস্কার-স্বরূপ প্রদান করা হয়।

তিনি কতদূর ভবিষ্যদ্দর্শী ছিলেন তাহার দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

এই হিন্দীভাষা সম্বন্ধেই তিনি বলিয়াছিলেন—"ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী-হিন্দুস্থানাই প্রধান এবং মুসলমানদিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশ-ব্যাপক। অতএব, অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই, কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎকালে,

সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে।" সামাজিক প্রবন্ধ, ভবিষ্যৎ বিচার, ভারতবর্ষের কথা, ভাষা বিষয়ে, ২২৫ পৃষ্ঠা। হিন্দু মুসলমানের মিলন সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ইংলণ্ডেও যেমন, ধর্ম্মভেদ জাতীয় ভাবের ব্যাঘাত করিতেছে না, ভারতবর্ষেও সেইরূপ হইয়া আসিতেছে। এখানকারও হিন্দু এবং মুসলমান ক্রমে ক্রমে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে এক মত হইয়া মিলিবে।" সামাজিক প্রবন্ধ, জাতীয় ভাব, ভারতবর্ষে মুসলমান, ১৭ পৃষ্ঠা।

আজ দেশে যে একটি নূতন ভাবের কথা শুনা যাইতেছে, নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যেন তাহারই পূর্ব্বাভাস দৃষ্ট হইতেছে—"শাস্ত্রে বলে, পৃথিবী নাগরাজ বাসুকির শিরোদেশে এবং বাসুকি স্বয়ং কূর্ম্মপৃষ্ঠে অবস্থিত। কূর্ম্মের প্রকৃতি কি। কূর্ম্মের প্রতি কোনও রূপ অত্যাচার করিলে, কূর্ম্ম অপর কোনও প্রতিকার চেষ্টা করে না। আপন মুখভাগ ও হস্তপদাদি সঙ্কুচিত করিয়া লয়, এবং নিজ আভ্যন্তরিক অপরিসীম ধৈর্য্যের প্রতি অবলম্ব করিয়া থাকে। কূর্ম্মই সহ্য। অতএব সহ্য ভ্রষ্ট হইও না। কূর্ম্মপৃষ্ঠ হইতে অপসৃত হইও না। অপসৃত হইলে, একেবারে রসাতল দেখিবে। অর্থাভাব জন্য কষ্ট হইয়াছে। আরও হইবার উপক্রম হইয়াছে। মনে কর, কিছুকাল অর্থকৃচ্ছ্র বাড়িতেই চলিল। তোমরা কি করিবে। কূর্ম্মের প্রকৃতি ধারণ করিবে। হাত পা মুখ সব ভিতরে টানিয়া লইবে। ভোগসুখলিপ্সায় বিসর্জ্জন দিবে। দেব-সেবা, অতিথি-সেবা পর্য্যন্ত লান করিয়া ফেলিবে। রাজ-দ্বারে ন্যায়-প্রার্থনা করিতে গিয়া অনর্থ অর্থ-ব্যয় করিবে না। গৃহ-বিচ্ছেদ গৃহেই মিটাইয়া লইবে। এইরূপে বল সঞ্চয় কর। কূর্ম্ম প্রকৃতিক হও। তোমাদের বল কেমন অধিক, ভক্তি কেমন দৃঢ়, তাহা সপ্রমাণ কর। যে প্রহার করে তাহার বল অধিক, না, যে প্রহার সহ্য করে তাহার বল অধিক। যে সহ্য করিতে পারে তাহারই বল অধিক।"—পুষ্পাঞ্জলি, সঞ্জীবনী-মূর্ত্তি; ৫৮ পৃষ্ঠা।

এই যে আমাদের সম্মুখে তাঁহার প্রতিকৃতি রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই ভূদেবকে একজন ঋষি-কল্প ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। পরন্তু, প্রকৃতভাবে তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় লাভ করিতে হইলে, তদীয় গ্রন্থাবলী পাঠ করা উচিত। প্রত্যেক হিন্দুর নিকটে আমার ইহাই ভূয়োভূয়ঃ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

শ্রীপদ্মনাথ দেব-শর্ম্মা।

৭।জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮।

স্মৃতির সুরভি (২)।

[১২৮ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি]

একদিন বিকালে আমাদের "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে" বেড়াইতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, ব্যোমকেশ বাবু কি কাজে ব্যস্ত আছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমি আপনার বাড়ীতে বেড়াইতে যাইব। কখন আপনাকে অবসর মত পাওয়া যাইবে, বলুন তো ?" তিনি বলিলেন, "ভা'য়া, এই "পরিষৎ-মন্দিরই আমার গৃহ—বৈঠকখানা! সকাল সন্ধ্যা, যখন আপনার ইচ্ছা, এখানেই আসিবেন, তাহা হইলে আমার দেখা পাইবেন।

আর অবসর? সে তো আমার জীবনে নাই।" বাস্তবিক, তাঁহার মত "সাহিত্য-পরিষৎ"কে এমন আপনার করিয়া আর কে লইয়াছিল? তাঁহার মত সমস্ত অবসর সময় এমন করিয়া "পরিষৎ" সেবায় কে উৎসর্গ করিয়াছিল?

ময়মনসিংহের "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের" অধিবেশন হইতে, প্রত্যেক বৎসর "সম্মিলনের" সময়, ব্যোমকেশ বাবু আমার কবিতা পাঠের ভার লইয়াছিলেন। এজন্য চুঁচুড়ার অধিবেশনে, তাঁহাকে কিছু বেগও পাইতে হইয়াছিল। "স্মৃতির সুরভি"তে সে অপ্রিয় আলোচনায় আবশ্যক নাই। চট্টগ্রামের 'সাহিত্য-সম্মিলনের" পূর্ব্বে তিনি আমাকে একবার লিখিলেন, "ভাই, এবার আপনার দেশে আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিব।" কিন্তু নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে তাঁহার এ ইচ্ছা আর পূর্ণ হইল না। তিনি সে সময়ে অসুস্থ হওয়াতে, আমার জন্মভূমিতে আমাকে আর আশীর্ব্বাদ করিতে আসিতে পারিলেন না। তথাপি, এ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও, তিনি আমার কথা ভুলেন নাই। সম্মিলন-ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট তাঁহার একখানি পত্র পাইলাম। তাহাতে লিখিয়াছেন, "আপনার কবিতা পাঠের জন্য আমি নলিনীকে নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইলাম। বিধাতা আমার সাধ পূর্ণ করিলেন না।" কি গভীর মমতা। "সম্মিলনে" তাঁহার অভাব, আমাকে বিশেষভাবে ব্যথা দিল।

শ্রদ্ধাস্পদ হীরেন্দ্রবাবু ও আমি একদিন জজ্ বরদা বাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তিনি তখন কলিকাতার "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে" পড়িবার জন্য তাঁহার "শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্" কবিতাটি প্রস্তুত করিতেছিলেন। তিনি আমাদিগকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সেবার 'সম্মিলনে" পাঠার্থ আমি যে "মাঙ্গলিক"-নামক একটী কবিতা লিখিয়াছিলাম, তাহার একখণ্ড তাঁহাকে উপহার দিলাম। তিনি আমার কবিতাটী পড়িয়া বলিলেন, "আপনার কবিতা চিরকালই মধুর সে সম্বন্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু আপনি 'সম্মিলনের" সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথকে "মহর্ষি-সন্তান" বলিয়া কবিতার মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। আপনি কি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, ব্যাস, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির ন্যায় "মহর্ষি" মনে করেন?" আমি বলিলাম, "তাহা নয়। তবে তিনি আমাদের তুলনায় "মহর্ষি" বটেন।" তিনি তখন হাসিমুখে বলিলেন "ঠিক বলিয়াছেন!" তিনি নূতন কোনো কাব্য লিখিতেছেন কিনা, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "আমি হেমচন্দ্রের বিশেষ ভক্ত। তাঁহার নামে আমি "হৈমী"-নামক একখানি বহি রচনা করিয়াছি। এ বহিখানি এখন প্রেসে গিয়াছে, প্রকাশিত হইলে আপনাকে একখণ্ড পাঠাইয়া দিব।" তারপর একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "এবার 'সাহিত্য-সম্মিলনের' জন্য আমি যে কবিতাটী লিখিয়াছি, তাহা আপনারা একটু শুনুন।" এই বলিয়াই তিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

হে হর, তোমার মহিমার পার
বিদিত কাহার, নিখিলে।
ফুটিবে কিরূপে তোমার স্বরূপ
অজ্ঞে স্তুতি রচিলে?
ব্রহ্মারও যদি বাক্য-বিভব
তোমা পানে চাহি মূর্চ্ছা-নীরব,—
কিবা অপরাধ, যাহা অসম্ভব
সাধনে যদি না মিলে?
মূঢ় মম এই স্তোত্র-রচনা,
স্বমাত-বন্ধা, বিফল-বচনা,
দীন এ প্রয়াস, পরাণের আশ,
দিওনা চরণে ঠেলে।
—ইত্যাদি।

কি উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠ তাঁহার। তিনি যখন সুদীর্ঘ কবিতাটী শেষ করিয়া নীরব হইলেন, তখন যেন তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে তাহা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্র দেবতার বিরাট তাণ্ডবমূর্ত্তি আমাদের মানস নেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমরা শ্রদ্ধা-নম্র হৃদয়ে তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম। ফিরিবার সময়, গাড়ীর মধ্যে, হীরেন্দ্রবাবু আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরদা বাবুর কবিতায় আপনার কেমন লাগিল?" আমি বলিলাম, "ভাব-গাম্ভীর্য্যে কবিতাটি খুব ওজস্বিনী হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বরদা বাবুর পঠন ভঙ্গী এত চমৎকার যে এখনও আমার কানে ঝঙ্কৃত হইতেছে! তাঁহার পড়িবার গুণে কবিতাটী যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উহাতে যে বড় লালিত্য আছে, তাহা আমার বোধ হইল না। আপনি কি মনে করেন?" তিনি বলিলেন, "আমারও তাই মত।"

* * *

একদিন বিকালে আমাদের "পরিষৎ মন্দিরে" ব্যোমকেশ বাবুর কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন ভদ্রলোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ব্যোমকেশ বাবু আমাদিগকে পরস্পর পরিচয় দিলেন। চিনিলাম, ইনিই বহু ভাষা-বিৎ পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ সতীশচন্দ্র। তিনি হাসিয়া বলিলেন—এইটাই আমার সহিত তাঁহার প্রথম কথা—"জীবেন্দ্র বাবু! আপনি যে ছেলেমানুষ! আমরা যে আপনাকে চল্লিশের কোঠায় মনে করিয়াছিলাম!" আমিও হাসিমুখে তাঁহাকে জানাইলাম, তিনি আমাকে যত "ছেলেমানুষ" মনে করিতেছেন, বাস্তবিক আমি তত 'ছেলেমানুষ' নই—আমি 'চল্লিশের কোঠার' কাছাকাছিই আসিয়াছি। তিনি আবার হাসিয়া বলিলেন, "যাঁহার চেহারা দেখিয়া বয়স অল্প মনে হয়, তিনি দীর্ঘজীবী হন। আপনিও দীর্ঘজীবী হইবেন।"—আমি তৎক্ষণাৎ গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "সে আশীর্ব্বাদ করিবেন না। জীবন যে বড় অশ্রু-মাখা।"

তারপর কতবার কত স্থানে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। প্রতিবার তাঁহার উদার ও সরল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ ও সুখী হইয়াছি। একদিকে তিনি যেমন অগাধ বিদ্যার আধার ছিলেন, অপরদিকে তেমনি অমায়িক ও অহঙ্কার-শূন্য ছিলেন। এককথায়, পাণ্ডিত্য, সারল্য ও ঔদার্য্য তাঁহার নির্ম্মল জীবনকে ত্রিবেণী-সঙ্গমে পরিণত করিয়াছিল।

* * *

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত দেখা করিতে গিয়াছি। তিনি সেইমাত্র কলেজ

হইতে ফিরিয়াছেন। "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ করিলেন। চট্টগ্রামে "সাহিত্য-পরিষদের" কার্য্য কিরূপ চলিতেছে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার অনৈক প্রবীণ বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দুই বন্ধুতে মিলিয়া কি যে সরল অট্টহাসি। প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, সে হাসি আর থামিতেই চায় না। কোন কথা নাই, বার্ত্তা নাই, কেবল হাসি—কেবল হাসি।! হাসির কারণ তেমন কিছুই নহে, অনেক কাল পরে দুই বন্ধুতে দেখা হইয়াছে, এই আনন্দ। হায়, এইরূপ আনন্দ ও হাসি আজকাল বড় দুর্ল্লভ হইয়া পড়িতেছে। সভ্যতার খাতিরে আমরা এখন ওজন করিয়া কথা বলি, ওজন করিয়া হাসি, বুঝি বা তেমন আনন্দ প্রকাশ করিবার মত আমাদের বুকের বিশালতাও কমিয়া আসিতেছে।! যাহা হউক, তাঁহাদের হাসি থামিলে রামেন্দ্র সুন্দর কাগজ পেন্‌সিল হাতে লইয়া আমায় বলিলেন, "জীবেন্দ্রবাবু। সাহিত্য-পরিষদের জন্য আমি আপনার নিকটে কয়েকজন নূতন সদস্য চাই। আপনি নাম বলুন, আমি লিখিতেছি।" সাহিত্য-পরিষদের হিত-কামনা তাঁহার যেন অন্য কোন চিন্তা নাই—কথা নাই।

* * *

সুবিখ্যাত জুয়েলার্স মণিলাল কোম্পানী প্রতি বৎসর, পয়েলা বৈশাখ নূতন খাতা খোলা উপলক্ষে আনন্দোৎসব করিয়া থাকেন। এ উৎসবে সাহিত্য সেবকগণ বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। এক বৎসর আমি সে সময়ে কলিকাতায় ছিলাম এবং এ উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলাম। যথারীতি গান বাজানা ও প্রবন্ধাদি পাঠ শুনিয়া ভোজনকক্ষে নীত হইলে দেখিলাম, আমার টেবিলের পার্শ্বে অপর দুই জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক উপবিষ্ট আছেন। তন্মধ্যে একজন আমার সুপরিচিত বাণী-সেবক বাণীনাথ। অপর ভদ্রলোককে আমি চিনি না। বাণীবাবু বলিলেন, আপনি কি "নব্য-ভারত"-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন বাবুকে চিনেন না? আপনি যে সর্ব্বদা তাঁহার কাগজে লিখিয়া থাকেন।" তাঁহার কথায় আমি যেমন আনন্দে বিস্ময়ে সচকিত হইলাম, দেবীপ্রসন্ন বাবুও যেন একটু চমকাইয়া আমার পানে চাহিলেন, বাণীবাবু তাঁহাকে আমার নাম বলিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহের সহিত গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "জীবেন্দ্রবাবু। আমরা শুনিয়াছি, আপনি কলিকাতায় আসিয়াছেন, ও হীরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে আছেন। আমার পুত্রবধূ আপনার সহিত আলাপ করিলে খুব সুখী হইবেন। কখন আপনার জন্য গাড়ী পাঠাইব, বলুন তো?" আমি বলিলাম, "আপনার গাড়ী পাঠাইবার দরকার নাই। আমি নিজেই আগামী কল্য বিকালে আপনার বাড়ী যাইব। এই কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ সত্য-প্রিয় মহাপুরুষ প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে কেমন আপনার করিয়া লইলেন। তাঁহার বজ্রের মত কঠোর হৃদয়ে এমনি কুসুমের মত কোমলতা ছিল!

* * *

কর্ম্মবীর দেবীপ্রসন্ন বাবু অকস্মাৎ লোকান্তরিত হইবার মাসখানেক আগে তাঁহার সহিত আমার শেষ দেখা হইয়াছিল। আমি একদিন বিকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া

দেখিলাম, তাঁহার ক্ষুদ্র আপিস ঘরটীতে তিনি একাকী বসিয়া আছেন। বড় বিমর্ষ, যেন কতই শ্রান্ত ক্লান্ত। আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলাম, "আপনি এই গরমে একা এই অন্ধকার ঘরে বসিয়া কি করিতেছেন ? কিছু অসুখ হয় নাই তো ?" তিনি বলিলেন "না, আমার অসুখ করে নাই। আমি একজন পীড়িত বন্ধুকে দেখিতে গিয়াছিলাম, এই মাত্র সেখান হইতে আসিতেছি। তাঁহার জীবনের আশা নাই। আমার সমবয়সীরা একে একে চলিয়া যাইতেছেন আমার মনও পরলোক-যাত্রার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।" হায়, তখন কে জানিত, তাঁহার এ কথাগুলির মধ্যে নির্ম্মম সত্য লুকান আছে ? অল্পক্ষণ চুপ্ করিয়া আবার বলিলেন "আপনার কি বড় গরম লাগিতেছে ? পাখা খুলিয়া দিতেছি। উহা সর্ব্বদা মাথার উপরে ঘুরিলে, সর্দ্দি লাগিবে বলিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি।" তারপর বহুক্ষণ নানাবিষয়ে আলাপ করিয়া, তিনি আমাকে বলিলেন, "যান, এবার আপনি বোমার সহিত দেখা করিয়া আসুন।" কিছুক্ষণ পরে আমি যখন তাঁহার পুণ্য-নিকেতন "আনন্দআশ্রম" হইতে বাহির হইতেছি, তখন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "জীবেন্দ্র বাবু। একখানি নূতন "নব্যভারত" লইয়া যান। ইহাতে আপনার লেখাও আছে।" তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, এই তাঁহার স্বহস্ত-প্রদত্ত শেষ-উপহার !

*   *   *   *

মিত্রোত্তম বিভূতি বাবু ও আমি রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুরের সহিত দেখা করিতে গিয়াছি। তিনি উপর তলায় ছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি নীচে আসিয়া বলিলেন, "জীবেন্দ্রবাবু কাহার নাম ? কে সারদাবাবুর পত্র লইয়া আসিয়াছেন ?" সেখানে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, তাঁহারা আমাকে দেখাইয়া দিলেন। সেই তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ, আলাপ। শেষ আলাপও বলা যাইতে পারে। কেননা, তারপর তাঁহার সহিত পত্রালাপ ভিন্ন আর চাক্ষুষ আলাপের সৌভাগ্য ঘটে নাই। যাহা হউক, কয়েকটী কাজের কথার পর আমি তাঁহাকে "সাহিত্য সভা" এবং "সাহিত্য সংহিতা"র কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "উভয়ই মন্দ চলিতেছে না। আপনাকে আমাদের "সাহিত্য সভার" বিশিষ্ট সদস্য করিয়া লইব এবং আপনাকে "সাহিত্য-সংহিতা" পাঠাইতে বলিব। আপনি তাহাতে লিখিবেন।" তাঁহার এই অযাচিত স্নেহে মুগ্ধ হইলাম। তারপর আমি যে কাজের জন্যে তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম, সে বিষয়ে তিনি আমাকে এতদূর সাহায্য করিলেন যে, আমি তাহা জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব না।

*   *   *

একদিন বিকালে আমি ও বিভূতি বাবু "সাহিত্য"-নায়ক সমাজপতি মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি সে সময়ে নীচের ঘরটীতে বসিয়া সবান্ধবে তাস খেলিতেছিলেন। তামাকের ধোঁয়ায় কক্ষটী আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, এমন কি, আমার নিশ্বাস লইতেও কষ্ট হইতেছিল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি এ ধোঁয়ার রাজ্যে বসিয়া কি করিতেছেন ?" তিনি সবিস্ময়ে আমার মুখের পানে চাহিলেন, তিনি আমাকে চিনিতেন না। বিভূতিবাবু তাঁহাকে আমার নাম বলিলে, তিনি আমাকে পরম সমাদরে গ্রহণ

করিয়া, সহাস্যে বলিলেন, "জীবেন্দ্র বাবু! আপনি বুঝি ও রসে বঞ্চিত!" তখন মহা হাসি তামাসার ধূম পড়িয়া গেল। "সাহিত্যের" তেজস্বী সুরেশচন্দ্র, যাহার তীব্র-মধুর কষাঘাতে যথেচ্ছাচারী লেখক-বৃন্দ সন্ত্রস্ত, তিনি শিশুর মত কি সরল ও রহস্য-প্রিয়। হাসির ফোয়ারা একটু থামিলে, তিনি আমাকে বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি, আপনি আমাদের হীরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে উঠিয়াছেন। আমি রোজই ভাবি, আপনার কাছে যাইব, আজ কাল করিয়া আর ঘটিয়া উঠে না। হাঁ, আপনি আসিয়াছেন বেশ করিয়াছেন। আমি কাল দুপুরে ঠিক আপনার কাছে যাইব, আপনি বাসায় থাকিবেন তো?" আমি সম্মতি জানাইয়া সকৌতুকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আগে আমার লেখার খুব গালাগালি দিতেন, এখন আবার এত প্রশংসা সুরু করিয়াছেন কেন?" তিনি তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে উত্তর দিলেন, "গালাগালি দিয়া দেখিলাম, আপনি কিছুতেই দমেন না, তাই এখন প্রশংসা করিয়া আপনাকে উৎসাহ দিতেছি।" আমি বলিলাম, "আমি যে নিন্দা-প্রশংসা দুইটাই সমান মনে করি—দুইটাই সমানভাবে উপেক্ষা করিতে চেষ্টা করি। নিন্দা প্রশংসার অতীত না হইলে যে নিষ্কামভাবে মায়ের পূজা হয় না।" তিনি আমার এ কথায় হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া পড়িলেন। কেন? ইহার উত্তর আজ কে দিবে?

* * *

একদিন সন্ধ্যাবেলা হেদোর পুকুর পাড়ে বেড়াইতেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একজন ভদ্রলোক আমাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবেন্দ্রবাবু! আপনি কখন কলিকাতায় আসিলেন? কোথায় আছেন?" এ অপরিচিতের দেশে এমন পরিচিতের মত কে সম্ভাষণ করিতেছেন? সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া চিনিতে পারিলাম, সুসঙ্গের সুধী-শ্রেষ্ঠ মহারাজ কুমুদচন্দ্র আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহাকে এ ভাবে এখানে দেখিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইলাম। তারপর সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে কত রাজ্যের কত কথা আরম্ভ হইল, কালিদাস, মাঘ, ভারবি হইতে সেক্ষপীয়র, মিল্টন, টেনিসন প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রায় কোন কবিই আমাদের সে আলোচনায় বড় বাদ গেলেন না। মহারাজের সংস্কৃত উচ্চারণ বড়ই সুন্দর ছিল। তিনি যখন কালিদাস প্রভৃতি হইতে শ্লোকাংশ আবৃত্তি করিতেছিলেন, তখন আমি মুগ্ধ-চিত্তে শুনিতেছিলাম। দেখিতে দেখিতে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল, তাঁহার সহিত সদালাপে এতক্ষণ যেন আত্মহারা ছিলাম, যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম, হেদোর পাড়ে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সান্ধ্য-ভ্রমণ-কারীরা দলে দলে বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছেন। আমরাও পরস্পর বিদায় লইলাম। কে জানিত, এই বিদায়ই শেষ বিদায়, অল্পকাল পরেই, বিদ্যা ও বিনয়ের অবতার, মহারাজ বাহাদুর আমাদের পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন!

* * *

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ, হরি ওঁ।

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

দলনী।

[সমালোচনা]

আজ আমরা এমন একটা সতী নারীর চিত্র পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব যাহাতে শৈবলিনী-সমালোচনা-কলুষিতা লেখনী ধন্যা হইবে।

কঠোর-হৃদয় নবাব মীরকাসেমের মত বীরের চিত্ত-দলনী বলিয়াই কি "দলনী" এই নামকরণ? কিম্বা, যৌবনেই এমন সুন্দর কুসুমটী দলিত হইয়া গেল বলিয়া, "দলনী" এই নামকরণ? দলনী, নবাব মীরকাসেমের ধর্ম্ম-পত্নী, শত যুবতী-সঙ্গ-কলুষ নবাবের প্রগাঢ় প্রেমের অধিকারিণী। বালিকাকৃতি যুবতী দলনী মীরকাসেমের বিশাল দেহের পার্শ্বে মহামহীরুহের সংলগ্না ক্ষুদ্র লতার মত ছিল।

দলনী আদর্শ সতী নারী। রাজোদ্যানের গোলাপ, দেবপূজার শতদল। সে যখন ক্ষুদ্র মস্তকে বিলম্বিত, ভুজঙ্গরাশি-তুল্য নিবিড় কুঞ্চিত কেশরাশি দোলাইয়া, সুগঠিত চম্পক-সুকুমার অঙ্গের সঞ্চালনে অন্তঃপুর মধ্যে রূপের তরঙ্গ ছুটাইয়া, ক্ষুদ্র বীণাটি করে লইয়া, তাহাতে মধুময় ঝঙ্কার তুলিত, ধীরে ধীরে, অতি মৃদুস্বরে, শ্রোতার ভয়ে ভীতা হইয়া, প্রেমগীতি গাহিত, তখন সে রাজোদ্যানের গোলাপ। তারপর, মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলকমলিনীর ন্যায়, মুখ ফোটে ফোটে, ফোটে না, সেই দলনী যখন "যদি আমার বধের আজ্ঞা দেন তথাপি সেই প্রভুর কাছে আমি যাইতে চাহি" এই কথা বলিয়াছিল, ভস্মাসনে বসিয়া ঊর্দ্ধ মুখে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে, গলদশ্রুলোচনে, রাজরাজেশ্বর প্রভুর অনুমতিতে বিষ ভোজন করিয়াছিল, তখন সে দেবপূজার শতদল।

দলনী বিষ ভোজন করিলেও, তাহা তাহার আত্মহত্যা নহে। যে আত্মহত্যাকারীর গতি অন্ধতামিস্র নরকে—সে আত্মহত্যাকারিণী দলনী নহে। পতিই দেবতা, পতিই তার নারী জীবনের প্রভু, সেই পতি-দেবতার লিখিত-আজ্ঞা পালন করিতে তাঁর দাসী বাধ্য। এ আজ্ঞা, সেই রাজরাজেশ্বরের স্বহস্ত দত্ত দণ্ড। এ দণ্ড অবহেলা করিতে সতী নারী পারে না। আজ্ঞা পালনের জন্যই এই বিষ-ভোজন। ইহা আত্মহত্যা নহে।

দলনী বিনয়লজ্জাদি-যুক্তা পতিপ্রেমমুগ্ধা "মুগ্ধা" নারী। স্বভাবতঃ মুগ্ধা নারী বলিয়াই সে, নবাবান্তঃপুরে বাস করিয়াও, কোন প্রগল্ভতা, কোন চাতুর্য্যই শিক্ষা করে নাই। মুসলমান নবাবদিগের অন্তঃপুরে এরূপ কুসুম খুব অল্পই ফোটে। এ যেন গোবরে পদ্মফুল। গীত গাহিতে বলিলে, সেই লজ্জাবনতমুখী হওয়া, বীণার তার অবাধ্য হওয়ায় সেই মহা গোলযোগ বাঁধা, ভীরু কবির কবিতা কুসুমের ফুটিতে যাইয়া না ফোটা, নবাব-অন্তঃপুরে এক অভিনব সৃষ্টি।

দলনী মীরকাসেমকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত! আপনার সত্বা তাঁহাতে মিশাইয়া দিয়া, বাদশাহের বাদশাহ ভাবিয়া ভক্তি করিত। আপনাকে বাঁদীর বাঁদীমত মনে করিয়া গর্ব্বিত হইত। স্বামীর জন্য সেই আকুলি বিকুলি করা, গুলেস্তা পড়িতে আরম্ভ করিয়া আবার সেই ফেলিয়া

দেওয়া, আপনা-ভোলা ভালবাসারই পরিচায়ক। স্বামী আসিয়াছেন শুনিয়াই বা কি আত্মহারা ভাব। বক্ষ তালে তালে নাচিতে থাকে, ধমনী নাচিয়া নাচিয়া উঠিতে থাকে, বীণার তার অবাধ্য হইয়া যায়, সুর কোন মতেই উঠে না।

দলনী বালিকাপ্রকৃতি অতি কোমল প্রকৃতি নারী মাত্র। স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায়, তাহার কর্ত্তব্য বুদ্ধি লোপ পায়, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। অন্ধকারময়ী রাত্রিতে, ছদ্মবেশে দাসী সঙ্গে, অমনি ভ্রাতা গুরগণ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। যুদ্ধ থামাইবার জন্য অমনই কাঁদিতে বসে। বালিকাপ্রকৃতি কাঁচা-বুদ্ধি বলিয়াই সে এই নবাব-পত্নীর পক্ষে যাহা অসম সাহসিক, তাহা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। স্বামী পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় রমাও একদিন গঙ্গারামের রাত্রে অন্তঃপুরে যাওয়া আসায় দোষ দেখিতে পায় নাই। পতির অমঙ্গলাশঙ্কায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা হইয়া, জনক-নন্দিনী সীতাও একদিন লক্ষ্মণকে, যাহা অকথ্য, তাহা বলিয়াছিলেন। কেহ বা অকথ্য কথা বলিল, কেহ বা অকর্ত্তব্য কার্য্য করিল।

দলনী পতিপরায়ণা সাধ্বী। ভ্রাতার সহিত সাক্ষাতে চলিয়াছে। ইহাতে তাহার পক্ষে, ধর্ম্মের চক্ষতে, অকর্ত্তব্য কার্য্য না হইলেও, নবাব-পত্নীর পক্ষে অকর্ত্তব্য কার্য্য। গোপনে, আপনার গণ্ডী ছাড়াইয়া যাওয়াই যে অন্যায়। অগ্নি বালক বলিয়া, দগ্ধ করিতে ছাড়ে না। দলনী বালিকা বুদ্ধিতে করিয়াছে বলিয়া, অন্যায়ের দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবে কেন? গুরগণ খাঁ যে ভ্রাতা—ইহা নবাব বা আর কেহই জানিত না। তথাপি এই নির্জ্জন-সাক্ষাৎ, রাত্রে অন্তঃপুর ছাড়িয়া গুরগণ খাঁর গৃহে, এই গোপন-সমাগম, যেই দেখিত, সেই এই কার্য্যটিকে অভিসারিকার কুৎসিত অভিসার বলিয়াই বুঝিত। দলনীর এত বড় দুঃসাহস, এত বড় বুকের পাটা। সু মনোবৃত্তি হইতে উদ্ভূত হইলেও, কার্য্যটিতে অতি বড় দুঃসাহস প্রকাশ পাইয়াছে।

দলনী অবশ্য দুঃসাহস ভাবিয়া এই কার্য্য করে নাই। তাই সে অত নির্ভীক। সে মনে প্রাণে অন্যায় করিতে জানে না। তাই সে ভয়ও পায় নাই। গুরগণ খাঁর মুখে অসঙ্গত কথা শুনিয়া, তাই সে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিতে পারিয়াছিল—"ভুলিয়া যাইও না, মীরকাসেম আমার জীবনে মরণে, প্রভু"।

"দ্বিতীয় নুরজাহান হইবে"—ভগ্নীর প্রতি ভ্রাতার এই উত্তর। দলনী গলদশ্রুলোচনে কাঁদিতে লাগিল। এই ঘৃণিত প্রস্তাবে দলনীর নারী-হৃদয় আহত হইল। কুসুমকোমলা প্রকৃতিতে সতীত্বের গর্ব্ব, সতীত্বের তেজ ফুটিয়া উঠিল। তখন ক্রোধে কম্পিতা হইয়া, সেই কোমলা নারী ভ্রাতাকে তিরস্কার করিল।

সতী নারী কুসুমের মত যতই কোমল হউক, তাহার মধ্যেও একটি বিদ্যুতের প্রখর জ্বালা বিদ্যমান থাকে। আঘাত পাইলেই তাহা ফুটিয়া থাকে। জনক-তনয়া সীতা, হনুমানের নিকট রামের অভিজ্ঞান চিহ্ন দেখিয়া, তাহার সহিত ফিরিতে সম্মতা হন নাই। সীতারামের রমাও, সহস্রলোকের সম্মুখে, রাজসভায় দাঁড়াইয়া, আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে কুণ্ঠিতা হন নাই। অন্তঃপুর-দ্বার রুদ্ধ হইলে, দলনীও কুলসমকে বলিতে পারিয়াছিল—"এখানে দাড়াইয়া ধরা পড়িব, সেই উদ্দেশ্যেই এখানে দাড়াইব, ধৃত হওয়াই আমার কামনা। যে ধৃত করিবে, 'আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে? প্রভুর কাছে? আমি সেইখানেই যাইতে চাই। অন্যত্র আমার

যাইবার স্থান নাই। তিনি যদি আমার বধের আজ্ঞা দেন, তথাপি মরণকালে তাঁহাকে বলিতে যাইব যে, 'আমি নিরপরাধিণী'।

দলনী স্বর্গ গঙ্গার মত পবিত্রা। পারিজাতের মত তাহার মনও পবিত্র। সে দলনী, নিজের মনে, ইংরাজের উপর স্বাভাবিক কোন ক্রোধ পোষণ করে না। কোনরূপ বিরক্তি বা ঘৃণা তাহার জন্মিবার কথা নহে। তথাপি ইংরাজের উপর তাহার একটি ক্রোধ ও বিরক্তির ভাব ছিল। মীরকাসেমের ক্রোধ বা বিরক্তির ভাব ছিল বলিয়াই, দলনীর ছিল। পতির যে শত্রু, সতীনারীর সেও শত্রু। ভিতরে ভিতরে ইংরাজের উপর মীরকাসেমের ভয় ছিল, দলনীর তাই ইংরাজের সহিত যুদ্ধ বাধিবার নামেই এত ভয়। আপনার মুক্তির জন্য, দলনী সামান্য রক্তারক্তিতে ভয় পাইবে, দলনী এমন ভীরু ছিল না। ইন্দুবালার মত তেজোহীনা কোমলা ছিল না। শত্রুর উপর সমবেদনা করিবে, এমন অপার্থিব 'করুণা' লইয়া সে জন্মগ্রহণ করে নাই।

পতির উপর দলনীর বিশ্বাস যেমন প্রগাঢ়, তাহার ভালবাসার উপর বিশ্বাসও তেমনই প্রগাঢ়। মহম্মদ তকির হস্তে, স্বামীর পরোয়ানা দেখিয়াও, তাহার বিশ্বাস জন্মে নাই। "স্বামী আমার স্নেহময়, এরূপ আজ্ঞা তিনি কখনই দিতে পারেন না। এ জাল পরোয়ানা।"

তারপর, পাপিষ্ঠ তকি যখন দলনীর নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাই প্রকাশ করিল, তখন দলনী বুঝিল, এ পরোয়ানা জাল নহে। স্বামী পাপিষ্ঠ তকির দ্বারা প্রতারিত হইয়াই এই পরোয়ানা দিয়াছেন। বস্তুতই মীরকাসেমকে বিশ্বাস করান হইয়াছিল যে, দলনী ব্যভিচারিণী। ধরা পড়িয়া বন্দিনী হইয়াছে। কাজেই বিষ-ভক্ষণে তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার পরোয়ানায় স্বাক্ষর করেন। বিচারক-হিসাবে কাজটি অবিমৃষ্যকারিতা-দুষ্ট হইয়াছে। আর পতি হিসাবেও, কাজটি নির্দ্দয় নির্ব্বোধের মত হইয়াছে।

স্বামী প্রতারিত হইয়াছেন, দলনী অবিশ্বাসিনী। এই বিশ্বাসেই বিষ-ভোজনে প্রাণদণ্ড আজ্ঞা দিয়াছেন। তখন দলনী ভাল করিয়া পরোয়ানা দেখিল, স্বামীর স্বাক্ষরটির পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। "প্রভুর আজ্ঞা, পালন করিতেই হইবে। রাজরাজেশ্বর, বাদশাহের বাদশাহ, পতিদেবতার আজ্ঞা, তাহার দাসী পালন না করিয়া পারে না"। তখন, তকির নিকট বিষ লইয়া আজ্ঞা-পালনের জন্য বিষ ভোজন করিল। পতির আজ্ঞা; দোষ গুণ বিচার করায় তাহার অধিকার নাই। দলনী কোন দ্বিধা না করিয়া সেই পতি-দত্ত দণ্ড গ্রহণ করিল। অন্যায়ের শতগুণ দণ্ড হইল। দুই দিন পরে স্বামীর সে রাজ্যচ্যুতি, ভগ্নহৃদয়ে সে প্রস্থান, নৈরাশ্যে সে মৃত্যু—দলনীর আর দেখিতে হইল না। সিরাজের জ্বলন্ত অভিশাপ, সে অখণ্ডনীয়। দলনী স্বর্গীয়া দেবী। সে অভিশাপের ফল, তাহার না দেখাই ভাল। তাই দলনী অগ্রেই প্রস্থান করিল।

আত্ম-সম্মানে ঘা পড়িলে, নারীহৃদয় আহত করিলে, সতীত্বের মাণিক অপহরণের চেষ্টা পাইলে, সতী সাধ্বী কোমলা নারী, ব্যাঘ্রীবৎ ভীষণা হইয়া উঠে। মহম্মদ তকি যখন দলনীর নিকট ঘৃণিত প্রস্তাব করিল, তখন সেই খর্ব্বাকৃতি নারী, তকির মত বীরপুরুষের বুকে প্রচণ্ড পদাঘাত করিল। আহত কুক্কুরের মত সেই কামুক পলায়ন করিবার পথ পাইল না।

দলনীর মৃত্যুকালে কেবল এই দুঃখ রহিল যে, প্রভুর সম্মুখে বসিয়া প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে পাইল না। মৃত্যু সময়ে, দলনী আসনে ঊর্দ্ধমুখে, ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে, জোড় করে বসিয়া আছে;

বিস্ফারিত পদ্মপলাশ চক্ষু হইতে জলধারা বক্ষে আসিয়া পড়িতেছে। আহা, স্বর্গের অম্লান কুসুম ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল। বিষ ভোজনের দৈহিক যন্ত্রণা, দলনীর নিকট তখন অতি তুচ্ছ। সতী সাধ্বী আত্ম-বিসর্জ্জনের পুণ্যে স্বর্গে স্থান পাইল। পতি প্রেমের বলে সে সতীকুঞ্জে আশ্রয়-লাভ করিল।

দলনী ছাড়িয়া গেল। পিছনে পিছনে রাজলক্ষ্মীও নবাবকে ত্যাগ করিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী ও দলনী, এই দুইটীই মিরকাসেমের প্রাণ ছিল। রাজলক্ষ্মীর বিশ্বাসঘাতকতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া, মূর্খ নবাব শেষে বুঝিয়া গেল, দলনীই তাহার তদ্গতপ্রাণা প্রেমময়ী পত্নী। নিজের দোষে কি রত্নই সে জলাঞ্জলি দিল। দলনীর জন্য নবাব শেষে কত কান্নাই কাঁদিল।

মহম্মদ তকি মীরকাসেমের বিচারে প্রাণদণ্ড পাইয়া, বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করিল। মাতার অভিশাপ হাতে হাতে পাইল। শুনিতেছি যে, আজকালকার ঐতিহাসিকেরা প্রমাণ করিতেছেন, মহম্মদ তকি, বিশ্বাসঘাতকতা দূরে থাক, প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী সেবকই ছিল। আমরা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিতে বসি নাই যে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিব। কবির সৃষ্ট চরিত্র আমরা যেমন পাইয়াছি, সেই মতই সমালোচনা করিলাম।

শ্রীরামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী।

স্বরাজ।

[১৫২ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি]

(১৩)

অরাজক-পন্থীর আদর্শে গঠিত সমাজে মানুষ শ্রম করিবে, বেতন পাইবে না। শ্রম, মানুষের প্রকৃতি-গত, শ্রমে মানুষ স্বভাবতঃ আনন্দ পায়। শ্রমে ধন-লাভ হয় বলিয়াই যে মানুষ শ্রম করে, তাহা নয়। শ্রম, মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। শ্রমেই মানুষের আনন্দ। অত্যধিক শ্রমে মানুষের বিরক্তি। অত্যধিক শ্রম, মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায়। শ্রমজীবিদিগকে বেতনের প্রলোভন দিয়া, অত্যধিক শ্রম করান হয়। তাহাতে ধনীর আরও ধন-বৃদ্ধি হয়। শ্রমজীবি অতি সামান্য বেতন পায়। ফলে, বৈষম্য বাড়িয়া চলিয়াছে। অত্যধিক শ্রম দূর করিতে হইবে। আর, বেতন-ব্যবস্থা পৃথক্-সম্পত্তি-মূলক। ধন-বৈষম্য দূর করিতে হইলে, পৃথক্-সম্পত্তি সমাজ হইতে দূর করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে, বেতন-ব্যবস্থাও দূর করিতে হইবে। তাহাতে, মানুষসকল অলস ও শ্রম-বিমুখ হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার কোনও কারণ নাই। বসুন্ধরার নিকট হইতে খাদ্য বা পানীয় বা সুখ-সাধন আদায় করিবার জন্য, মানুষ শ্রম আপনা আপনি করিবে। অরাজক-পন্থীর আদর্শে গঠিত সমাজে, মানুষ ধনও সুখ-সাধন ভোগ করিবে। বেতন-ব্যবস্থা থাকিবে না বটে, ভোগের ব্যবস্থা ত থাকিবে। যাহার যতটা প্রয়োজন, তাহার ততটা ভোগের ব্যবস্থা করা হইবে।

অরাজক-পন্থী বলেন যে, সমাজের মূলভিত্তি হইবে, মানব-মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—

সহযোগিতা (co-operation)। মানুষ দল বাঁধিয়া সমাজে থাকিতে চায়। দশের সহিত সমাজে বাস করাই, তাহার স্বভাব। সহযোগিতা বর্জ্জন করিলে সমাজ গড়ে না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ, সত্যের আংশিক প্রকাশ দেখিয়া, সর্ব্বত্র জীবন-সংগ্রাম খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন ও সে সংগ্রামে যোগ্যতমের জয় (survival of the fittest) ঘোষণা করিয়াছেন। বিবর্ত্তনবাদের এই জীবন-সংগ্রাম ও সংগ্রামে যোগ্যতমের জয়, আংশিক সত্য মাত্র। ইহা পূর্ণ সত্য নহে। সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতা (competition) যদি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, সহযোগিতা (co-operation) তাহার তেমনই সহজ ও স্বাভাবিক। ভয় বা ঈর্ষা যদি মানুষের স্বভাবগত, প্রেমও মানুষের তেমনই স্বভাবগত। রাস্তায় তোমার ও আমার উভয়ের যাতায়াতের স্থান থাকিলে, পথ চলিবার সময় তুমি যে আমাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেও না, তাহা শুধু পুলিশের ভয়ে নয়। রাস্তায় চলিয়া যাইতে আমি পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলে, তুমি যে তাড়াতাড়ি আসিয়া আমাকে হাতে ধরিয়া তোল, তাহাও কি পুলিশের ভয়ে? কেহ হয়ত বলিবে যে, তাহা মানুষের প্রশংসার প্রলোভনে। তাহাই কি সব সময়ে ঠিক? তোমার আমার জীবনে এমন অনেকবার হইয়াছে যে, যাহাকে হাতে ধরিয়া তুমি তুলিয়াছ, সে তোমাকে চিনিত না। আজও হয়ত সে তোমাকে চেনে না। তুমি তাহাকে তুলিয়া দিয়া, তাহার পায়ের উপর তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিয়া, তোমার নিজের কাজে তুমি চলিয়া গিয়াছ সে ছাড়া অপর কেহ দেখিতেও পায় নাই যে, তুমি তাহাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়াছ। সে তোমার নামও জানিতে পারে নাই। তুমি, আমি, সকল মানুষ এরূপ করে কেন? করে, কারণ সহযোগিতা স্বাভাবিক। সর্ব্বত্র যদি প্রতিযোগিতা ও যোগ্যতমের জয় হইত, তবে শিশু কি এ সংসারে এত যত্ন পাইয়া বড় হইতে পারিত? পিতৃ-মাতৃ-হীন অসহায় শিশুকে ঘরে আনিয়া তুমি যে মানুষ করিতেছ, তাহাতে তো যোগ্যতমের জয় প্রমাণিত হয় না তাহাতে প্রমাণিত হয়, মানুষ সামাজিক জীব, প্রেম ও সহযোগিতা তাহার স্বভাবগত।

এই স্বাভাবিক সহযোগিতার উপর সমাজ গড়িয়া তোল। লোকে শ্রম করিবে, শ্রম করিয়া বেতন চাহিবে না। ধন, সুখসাধন, যতটুকু যাহার প্রয়োজন ভোগ করিবে। মুদ্রার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজনীয় খাদ্য বা পানীয় কিনিবে না। শ্রম দ্বারা খাদ্য, পানীয়, সুখসাধন, সব উৎপন্ন করা হইবে ও যাহার যতটা প্রয়োজন ভোগ করিবে। সমাজে শাসন থাকিবে না, পুলিস থাকিবে না, সৈন্য থাকিবে না, কারাগার থাকিবে না, ফাঁসিকাঠ ত থাকিবেই না। ধন-বৈষম্য দূর হইয়া গেলে, সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি থাকিবে না। আমার যাহা প্রয়োজন তাহা যদি সময় মত পাই, আমার চুরি বা ডাকাতি করিবার আবশ্যকতা থাকে না। এ কি সমাজ লইয়া মানুষ আছে? ধন-বৈষম্য অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে, অপরাধ প্রবৃত্তি মনে জাগাইয়া রাখিবার সকল আয়োজন সমাজে রাখিতেছে, আবার, শাসন ভয়ে, অপরাধ-প্রবৃত্তি দমনের চেষ্টা করিতেছে। একদল লোক সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি পোষণ করিতেছে, অপর একদল লোক, অপরাধী দলকে ধরিয়া, বল বা শক্তি দ্বারা শাসন করিবার জন্য, সময় বুদ্ধিও শক্তির অপব্যবহার করিতেছে। আর সমাজের সকল

লোকে মিলিয়া, অপরাধ প্রবৃত্তি যাহাতে সর্ব্বদা মানব মনে জাগ্রত থাকে তাহার ব্যবস্থার, ঐ ধন-বৈষম্যের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিতেছে। কাহারও বা শাসন হইতেছে, কাহারও বা শাস্তি হইতেছে না। আর অধিকাংশ সমাজ দ্রোহী, শাসনের পরে, কারা-মুক্ত হইয়া, পুনরায় অপরাধ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ধন বৈষম্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, অপরাধ-প্রবৃত্তি মনে জাগ্রত রাখিবার সার্থকতা কি? তাহার পরে, আবার কারাগার ও ফাঁসিকাঠের ভয় দেখাইয়া, অপরাধ প্রবৃত্তি দমনের নিষ্ফল চেষ্টারই বা সার্থকতা কি? বৈষম্যের কারণ দূর কর কারাগার ও ফাঁসি-কাঠ আপনিই দূর হইবে। আর বৈষম্য দূর করিবার পরেও যদি মানুষ মানুষকে আঘাত করে বা বধ করে, তাহার জন্য ভয় পাইবার কিছু নাই! পুলিস, সৈন্য, কারাগার, ফাঁসিকাঠ রাখিয়াও ত চুরি, ডাকাতি, জখম, খুন নিবারিত হয় নাই। সমাজকে ভাঙ্গিয়া সাম্যের নূতন আদর্শে, প্রেম ও সহযোগিতার ভিত্তিতে, অরাজক-সমাজ গড়িয়া তোল। যত দিন সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন চুরি, ডাকাতি, জখম খুন কিছু চলুক। এখনই কি তাহা নিবারিত হইয়াছে? অন্তত মহত্তর উন্নত সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হওয়া যাক্। অরাজক-পন্থার এই কথা কি ব্যাধিতের নিরর্থক স্বপ্ন-মাত্র?

(১৮)

এই বল বিবর্জ্জিত, সহযোগিতা-মূলক, প্রেম মধুর সমাজের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কোথায়ও মানুষ ইহা গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। শাসন ও শক্তি প্রয়োগ নাই, আর সমাজের প্রত্যেকের সম্মতির উপর নির্ভর—আধুনিক ইতিহাসে এরূপ সমাজ প্রতিষ্ঠার ছোটখাটো চেষ্টা মাঝে মাঝে হইয়াছে। কিন্তু এরূপ সমাজ টেঁকে নাই। ইহা যদি এতই সহজ ও স্বাভাবিক, তবে ইহা জন্মে নাই কেন? শক্তি-মূলক রাষ্ট্র ত কেহ পরামর্শ করিয়া, যুক্তি-তর্কের পর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, চুক্তি করিয়া গড়ে নাই। জনসমাজের ইতিবৃত্তে, একদিন একপক্ষে একজন মানুষ ও অপরপক্ষে বহুসংখ্যক মানুষ একত্র মিলিত হইয়া, এই চুক্তি করিল যে, সেই একজন মানুষ রাষ্ট্রপতি হইবে আর বহু মানব রাষ্ট্রের প্রজা হইবে, এরূপ প্রমাণ ত পাওয়া যায়-ই না এরূপ অনুমান করিবারও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মানবেতিহাসে এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহা হইতে অনুমান করা চলে যে, একদিন এক বা একাধিক লোক একপক্ষে ও বহু মানব অপরপক্ষে মিলিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, একটা রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহাতে এক বা একাধিক রাষ্ট্রপতি থাকিবে, রাষ্ট্রপতি সুশাসন করিবে, আর প্রজাগণ রাজভক্ত হইয়া চলিয়া, শান্তিরক্ষা করিবে, আর যে সব প্রজা, রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহাদের শাসন হইবে, শাসনের জন্য বল বা শক্তি প্রয়োগ করা হইবে, শক্তি-প্রয়োগের জন্য সেনা থাকিবে। ইতিহাসের সাক্ষ্য ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মানব সমাজের শৈশবাবস্থায়, জ্ঞানী শক্তিশালী গুণী লোক, দলপতি বা রাষ্ট্রপতি হইয়াছেন। তাঁহাকে অপরে মানিয়া নিয়াছে। রাষ্ট্র আপনা আপনিই জন্মিয়াছে। কেহ পরামর্শ করিয়া, চুক্তি করিয়া, সৃষ্টি করে নাই। দল বাঁধিয়া, সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে করিতে মানুষের মধ্যে শক্তি-মূলক রাষ্ট্র স্বভাবতঃই উদ্ভূত হইয়াছে। প্রারম্ভে, বিচার, তর্ক, যুক্তি ও চুক্তির কোনও প্রমাণ পাওয়া

যায় না। সহযোগিতা-মূলক অরাজক-সমাজ যদি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক হয়, তবে ইহা স্বভাবতঃ গড়িয়া উঠিল না কেন? এত রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল, অরাজক-সমাজ অদ্য পর্য্যন্ত গড়িয়া উঠিল না কেন? সভ্যতার শৈশবে মানুষ বর্ব্বর ছিল। শিকারী মানুষের মধ্যে এরূপ সমাজ গড়িয়া না ওঠা, বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কিন্তু, আজ দুই সহস্র বৎসরের অধিক কাল, বুদ্ধ গোতমের মৈত্রী-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। তাহার পরে, যীশুর প্রেমের বাণী মানুষের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়াছে। তবুও এ সমাজ টেকে না কেন? আজও মানুষের স্বভাবে তবে এমন কিছু আছে, যাহাতে এ সমাজ টিকিতে পারিতেছে না। পরন্তু, রাষ্ট্র, মূলধন ও পৃথক সম্পত্তির বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করিয়া, এই বল-বিবর্জ্জিত, সহযোগিতা-মূলক অরাজক-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসে, অনেকে নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া বল ও শক্তির সাহায্যে, রাষ্ট্রপতিদিগের রক্তপাত করিয়াছে। সমাজ হইতে শক্তি-প্রয়োগ দূর করিবার জন্য, তাহারা সেই শক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছে। পুরাতন সমাজ ভাঙ্গিবার জন্য এই সংস্কারকদল যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে রাষ্ট্র তাহার শতগুণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া, সংহারক সংস্কারকদিগকে বিনাশ করিয়াছে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, মানুষের স্বভাবে এমন কিছু আজও রহিয়াছে যাহার দরুণ শক্তিকে বাদ দিয়া, সমাজ-সংস্কার বা সমাজ-সংরক্ষণ কোনটাই চলিতেছে না।

জন-মানব-শূন্য কোনও দেশে গিয়া, অরাজক-পন্থী একদল মানুষ দলের প্রত্যেকের সম্মতির উপর নির্ভর করিয়া শাসন-বিবর্জ্জিত সমাজ গঠন করিতে চেষ্টা করিলে বরং তাহা সহজ হইতে পারে। কিন্তু যে দেশে পৃথক সম্পত্তির ভিত্তিতে শক্তি-মূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত আছে, সে দেশে বল-বিবর্জ্জিত সহযোগিতা-মূলক অরাজক-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে বল বা শক্তির সাহায্য ছাড়া, চেষ্টা সফল হইবে এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। যাহারা পৃথক সম্পত্তি ভোগ করিতেছে, যাহারা মূলধন খাটাইয়া সুদ পাইতেছে রাষ্ট্র বজায় থাকিলে যাহারা উত্তরাধিকার সূত্রে মূলধন ও সুদ ভোগ করিবার আশা রাখে, যাহারা জমিতে স্বত্ব-স্বামীত্ব দাবি করিয়া জমিতে অপরের শ্রমে উৎপাদিত ফসল ভোগ করিয়া আসিতেছে, যাহারা বহু মানবের উপর প্রভুত্ব করিতেছে রাষ্ট্র বজায় থাকিলে যাহাদের অর্থ মান বা প্রতিপত্তি বজায় থাকে, এরূপ অতি অল্পলোকই, বিনা রক্তপাতে, তাহাদের ধন মান বা প্রতিপত্তির ভোগ বা ভোগের আশা বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইবে। ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের অধিকারী কৃষকগণও তাহাদের স্বীয় স্বীয় ভূমিখণ্ডে তাহাদের স্বত্ব স্বামিত্ব আর থাকিবে না, এ প্রস্তাবে সহজে সম্মত হইবে না। সাধারণ শ্রমজীবিগণ যদি বা ইহাতে সম্মত হয়, সুনিপুণ কারিকর শ্রম-জীবিগণ (skilled workmen) ইহাতে সম্মত হইবে না, কারণ তাহারা জানে যে, তাহারা এক মত হইয়া জোট করিলেই, ধনীর নিকট হইতে ইচ্ছামত উচ্চ বেতন সহজে আদায় করিতে পারে। বল-বিবর্জ্জিত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া, এইজন্য একদল অরাজক পন্থী, গত্যন্তর না দেখিয়া, অবশেষেই বলের ঐ শরণাপন্ন হইয়াছে ও আদর্শের জন্য হাসিমুখে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিয়াছে।

বৈষম্য হইতে সাম্যে উপনীত হইতে, পথে মারামারি, কাটাকাটি রক্তারক্তি! মানুষ জন মানবশূন্য নূতন দেশ বাছিয়া নিয়া, তথায় সাম্যবাদীর শাসন-মুক্ত বল-বিবর্জ্জিত সমাজ স্থাপন

করিতে চাহে না। মানুষ চাহে যে, এই শক্তি-মূলক রাষ্ট্রগুলিকে সহযোগিতা-মূলক সমাজে পরিণত করিতে হইবে। সুতরাং বৈষম্য হইতে সাম্যে উপনীত হইবার পথে, বল বা শক্তির পৈশাচিক লীলা, অনিবার্য। এ পথ পার হইয়া আসিতে পারিলে, তবে ত বল বা শক্তির হাত হইতে নিস্তার। পথে কত কাল কাটাইতে হইবে, কে জানে? পথ পার হইয়া আসিয়া, সাম্যের সমাজেই বা মানুষ কতকালে বল বা শক্তির হাত হইতে নিস্তার পাইবে, তাহা কে জানে? সহযোগিতা-মূলক সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা কতকাল সাম্যের আলয় থাকিবে, কে বলিতে পারে? রাষ্ট্রবাদী বলেন যে, পথে কত কাল কাটিবে তাহা যদি অনিশ্চিত, পথে বল, শক্তির পৈশাচিক লীলা যদি সুনিশ্চিত, পথ পার হইয়া আসিয়া, সহযোগিতামূলক সমাজে পৌঁছিলে সেখানে সাম্য যদি স্থির স্থায়ী ও অচল না হইয়, তবে, তোমার অরাজক-সমাজ ত আলেয়া! তবে শক্তি-মূলক রাষ্ট্র কি দোষ করিল? সেখানে ত উপস্থিত ব্যবহার বা আইনের বন্দোবস্ত করিয়া, বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বল বা শক্তির প্রতাপ খর্ব করা হইয়াছে। অন্যান্য উপায়ে, সেখানে বৈষম্য-জাত অত্যাচার নিবারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আর মানুষ যখন প্রেমের ধর্ম্ম লইয়া, সতেজ হইয়া দিব্যালোকের দিকে ধীর নিশ্চিত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইবে, তখন ত আর সাম্যে প্রতিষ্ঠিত বল-বিবর্জ্জিত সমাজ, আলেয়ার আলো থাকিবে না।

ইহার উত্তরে, রুশ ভূমির অরাজক-পন্থী টলষ্টয় আজ পচিশ বৎসর হইল বলিয়াছেন যে, শক্তি-মূলক রাষ্ট্রকে শাসন-মুক্ত সহযোগিতা-মূলক সমাজে পরিণত করা হইবে, বল বা শক্তির সাহায্য ব্যতীত। শক্তির সাহায্য যদি একবার নিয়াছ, শক্তির সাহায্য তোমাকে চিরকাল নিতে হইবে। অরাজক-পন্থিদের বল বা শক্তির উপদ্রবে, বর্ত্তমান শক্তিমূলক রাষ্ট্রের অন্তর্দ্ধান, সহজ-সাধ্য হইবে না। যদি-ই বা বলের সাহায্যে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, তাহার স্থানে ভবিষ্যতে যে সমাজ গড়িয়া উঠিবে, তাহাও শক্তি-মূলক হইয়া দাঁড়াইবে। তাহা রক্ষা করিবার জন্য চিরকাল ঐ বল বা শক্তিরই সাহায্য প্রয়োজন হইবে। টলষ্টয় বলেন যে, এই শক্তি-মূলক রাষ্ট্র ভাঙ্গিতে হইবে। শাসন-মুক্ত, বল-বিবর্জ্জিত অরাজক-সমাজ গড়িতে হইবে। কিন্তু বল বা শক্তির তিলমাত্র সাহায্য লওয়া হইবে না। রাষ্ট্র তোমাদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করিবে, তোমরা কিন্তু বল প্রয়োগ করিতে পারিবে না। অশুভের বিনিময়ে অশুভ প্রতিদান করিতে পারিবে না। অশুভকে বলদ্বারা রোধ করিবে না (resist not evil)। ইহা যীশু-প্রচারিত প্রেমের ধর্ম্মের অনুজ্ঞা। রাষ্ট্র-শক্তি তোমাদিগকে ধরপাকড় করিবে, তোমাদের বিচার হইবে, বিচারে তোমাদের কারাবাস বা ফাঁসির আদেশ হইবে। তোমাদের কর্ত্তব্য, এই সকল অশুভের পরিবর্ত্তে, সরল শুভ-ইচ্ছার প্রতিদান, বিচারে যোগ না দেওয়া, কারাদণ্ড বা ফাঁসির আদেশ, হাসিমুখে দৃঢ়চিত্তে বরণ করিয়া লওয়া। তোমরা যদি এইরূপ অশুভের প্রতিদানে শুভ দিতে পার, রাষ্ট্রের ভিত্তি আপনা শিথিল হইয়া যাইবে। শক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিশাল রাষ্ট্র আপনা আপনি ধসিয়া পড়িবে। রাষ্ট্র শক্তি যখন তোমাদিগকে নির্য্যাতন করিবার চেষ্টা না করে, তখন তোমাদের কি কর্ত্তব্য? ঐ শক্তি-মূলক রাষ্ট্রের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের

পোষণ হয়, তোমাদেরই সহকারিতায়। তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমরা আর রাষ্ট্রের শিক্ষালয়ে শিক্ষকতা করিবে না, বা তোমাদের সন্তানদিগকে তথায় শিক্ষালাভের জন্য পাঠাইবে না। রাষ্ট্রের সৈন্য ত, তোমরাই। তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে, আর সৈনিকের কাজ করিবে না, সমর-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে যাইবে না, কেহ সৈনিক হইবে না, পুলিস হইবে না, বিচারক হইবে না, সাক্ষী হইয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইবে না, ব্যবহার-জীবী হইবে না, পঞ্চায়েৎ সালিস হইবে না, জুরি (juror) হইয়া বিচারের সহায়তা করিবে না। তোমরা প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা কর, তোমরা ভূম্যধিকারী থাকিবে না, বণিক্ থাকিবে না, মুদ্রাযন্ত্র রাখিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে না, সংবাদ পত্রের স্বত্বাধিকারী থাকিবে না। কারণ, প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষভাবে, সকলই শক্তি-মূলক রাষ্ট্রের সহায়ক ও বৈষম্য-পোষক। তোমরা ব্যবস্থাপক সভায় যাইবে না, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন সমিতিতে যোগ দিবে না। এক কথায় বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত, শক্তি-মূলক রাষ্ট্রের যত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহার সহায়তা বা পোষণ করিতে পারিবে না। সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া এই প্রতিজ্ঞা পালন কর, দেখিবে, শাসন, ও শাসনের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি-মূলক রাষ্ট্র অন্তর্হিত হইবে। বৈষম্য হইতে সাম্যে উপনীত হইতে পথে বল বা শক্তির পৈশাচিক লীলা একেবারে নিবারিত না ও হইতে পারে, কিন্তু, তাহার জন্য তোমাদের দায়িত্ব থাকিবে না।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

কটকে মহাত্মা গান্ধী।

বিগত ২৩ শে মার্চ্চ, মহাত্মা গান্ধী কটকে আগমন করিয়াছিলেন। সেই দিবস ও তৎপর দিবস সন্ধ্যার সময় শুষ্ক "কাঠজুরী" নদীর বালুকাময় বিস্তীর্ণ গর্ভে দুইটী বিরাট সভা আহুত হইয়াছিল এবং তাহাতে মহাত্মা হিন্দীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রথম দিবস তিনি অসহযোগ নীতির মত ও উদ্দেশ্য সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যা করেন, এবং দ্বিতীয় দিবস বিশেষ ভাবে ছাত্রদের জন্য বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতাতে বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্কুল কলেজ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া, অসহযোগনীতি অবলম্বনের আবশ্যকতা ছাত্রদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মুসলমানদিগের "কদম্-রসুল" এ ও হিন্দুদিগের "বিনোদবিহারী" মন্দির প্রাঙ্গনে তিনি আরও দুইটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ২৪ শে মার্চ্চ, তিনি কটক পরিত্যাগ করেন। কাঠজুড়ী নদীগর্ভে তিনি যে দুইটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন আমি সেই দুইটী শুনিয়াছিলাম, তাঁহার অপর বক্তৃতা আমি শুনি নাই। তাঁহার বক্তৃতার ভাষা অতি সহজ ও সুমিষ্ট, তাহাতে অপরের প্রতি বিদ্বেষ নাই, কোন তীব্র সমালোচনা নাই, অযথা বাক্যাড়ম্বর নাই। কুৎসিত অশ্লীলতা তাঁহার বাক্যকে অপবিত্র করে না; অসহিষ্ণুতার তীব্র হলাহল তাঁহার বক্তৃতাকে বিষাক্ত করে না; একটী দিব্য শুভ্র পবিত্রতা তাঁহার সকল কথার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় মনকে পবিত্র করে। যাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করেন ও তাঁহার অসহযোগ

নীতির মত প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাদের সহিত মহাত্মার পার্থক্য দেখিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়।

দ্বিতীয় দিবসের বক্তৃতার পর মহাত্মার আহ্বানে শ্রোতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেই সকল প্রশ্ন ও মহাত্মার প্রদত্ত উত্তর নিয়ে প্রদত্ত হইল।

প্রথমেই একটী ছাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"যে সকল ছাত্রের গৃহ গড়জাত করদ রাজ্যে অবস্থিত, তাহারা যদি অসহযোগনীতি অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহাদিগের পৈত্রিক সম্পত্তি রাজারা বাজেয়াপ্ত করিবেন। এরূপ হলে কি করা কর্ত্তব্য।" মহাত্মা তাহার উত্তরে বলিলেন—"কোনও হিন্দু রাজা পুত্রের দোষে পিতার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবেন বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না। যদি সত্য সত্যই এরূপ ঘটে, তথাপি অসহযোগনীতি অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।" তৎপরে, অপর একটী ছাত্র বলিল—"ডাক্তারী পড়িতে তো কোনও দোষ নাই কারণ তাহা দ্বারা সমাজের সেবা করা যায়। ডাক্তারী পড়াও কি ছাড়িতে হইবে।" মহাত্মা বলিলেন—"ডাক্তারী পড়িবার কোনও আবশ্যকতা নাই। ত্রিশকোটী লোক এখন দারিদ্র্য-দুঃখে প্রপীড়িত, তাহাদের জন্য ঔষধ প্রস্তুত করা আবশ্যক ডাক্তারী পড়িয়া কি হইবে? আমি দিল্লীতে এক ইউনানী চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছি, যদি কাহারও চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিবার ইচ্ছা হয়, তবে সে সেই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তী হইতে পারে।" কেন যে ডাক্তারী শিক্ষা না করিয়া, ইউনানী শিক্ষা করিতে হইবে, এবং কটকের ছেলের পক্ষে দিল্লী যাইয়া শিক্ষালাভ করা সম্ভবপর ও সুবিধাজনক কিনা, আর সমগ্র ভারতবর্ষের ছাত্রদের পক্ষে সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করা সম্ভবপর কিনা, তিনি এ সকল বিষয় কিছুই বলেন নাই।

তৎপরে আমি তাঁহাকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন সকল করিয়াছিলাম। আমি যখন আমার বক্তব্য প্রকাশ করিতেছিলাম, তখন মহাত্মার শিষ্যবৃন্দ যথেষ্ট অসহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিলেন। মহাত্মা তাহাদিগকে নিষেধ করাতে, আমার বক্তব্য প্রকাশ করা সম্ভবপর হইয়াছিল। তিনি না থাকিলে, তাঁহার শিষ্যগণের হস্তে যে আমাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা-ভোগ করিতে হইত তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। যাহা হউক, আমি তাহাকে বলিলাম—

"আমি বহু সন্তানের পিতা এবং আমার সন্তানদিগের মধ্যে অনেকে বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ স্কুল ও কলেজে শিক্ষালাভ করিতেছে। আমি দুইদিন আপনার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছি, সংবাদ-পত্রে আপনার যে সকল মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও পাঠ করিয়াছি। অপরদিকে, ভারতবর্ষের বিগত দুই সহস্র বৎসরের ইতিহাসও আমি মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি আপনাকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই—

"(১) আপনি কি ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজ শাসনকে ভারতের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলের হেতু বলিয়া মনে করেন?

"(২) ভারতের বিগত দুই সহস্র বৎসরের ইতিহাস, আমাদের পরাধীনতারই ইতিহাস। পুনঃ পুনঃ আমরা বিদেশীর দ্বারা পরাজিত হইয়াছি এবং সুদীর্ঘকাল বিদেশীর শাসনাধীনে বাস করিতেছি। ইংরাজ আসিবার পূর্ব্বে তো এদেশে ইংরাজী শিক্ষা ছিল না। তবে কেন ভারতের এরূপ দুর্গতি ঘটিয়া আসিতেছে?

"(৩) বর্ত্তমান সময়ে যে সমগ্র ভারত-ব্যাপী রাজনৈতিক জাগরণ, যে স্বাধীনতার ভাব দেখিতেছি, পূর্ব্বে তো কখনও তেমন জাগরণ দেখা যায় নাই। এই জাগরণ, ইংরাজী শিক্ষা ও শাসনের ফল বলিয়াই মনে হয়। তবে, ইংরাজী শিক্ষাকে নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলের হেতু বলিয়া মনে করিব কেমন করিয়া?

"(৪) ইংরাজী শিক্ষা আমাদের দেশে অনেক মহাপুরুষকে উৎপন্ন করিয়াছেন, যেমন রাজা রামমোহন রায়, লোকমান্য তিলক প্রভৃতি, আপনি নিজেও তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। আপনারা কি ইংরাজী শিক্ষার ফল নহেন? তবে কেমন করিয়া বলিব ইংরাজী শিক্ষা ভারতের কোনই সুফল প্রসব করে নাই! *

"(৫) আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থাও ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। আপনি গতকল্য বলিয়াছিলেন যে, ভারতের বাইশকোটী লোক হিন্দু, কিন্তু, জাতিভেদের ফলে, বাইশ কোটী হিন্দুর মধ্যে, ছয়কোটী অস্পৃশ্য। বিড়াল ঘরে প্রবেশ করিলে, আমরা তাহাকে ঘৃণা করি না, কিন্তু আমাদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ছয়কোটি লোককে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে। তাহা ছাড়া, অপরাপর নিম্নজাতির লোকও আছে, অস্পৃশ্য না হইলেও, যাহাদের সামাজিক অবস্থা অতীব হীন। আর তাহাদের সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক। এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দূর করিবার জন্য আমার মনে হয়, ইংরাজী শিক্ষার উদার সাম্যভাব, আমাদের সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। আর আমাদের সমাজের এই দুরবস্থা বিদূরিত হইবার পূর্ব্বে, যদি অসহযোগনীতির বলে, স্বরাজ লাভ আমাদের পক্ষে সম্ভবপরও হয়, তবে কি আমরা তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইব?"

---

* 'রামমোহন ইংরাজী শিক্ষার ফল কি না'—এই প্রশ্নের উত্তর, সোজাসুজি 'না' বলা চলে না। 'ইংরাজী শিক্ষা' এই কথাটিকে আমি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করিয়াছি ও করিতেছি। আমার মনে হয়, সেই অর্থে রামমোহনকে ইংরাজী শিক্ষার ফল বলিলে, বিশেষ দোষ হয় না। তিনি বোধ হয়, বাইশ বৎসর বয়সের সময় ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজী ভাষার সাহায্যে তিনি ইউরোপের সকল প্রকারের উন্নত চিন্তা ও ভাবের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ইউরোপের সকল উন্নত সাহিত্য তিনি প্রধানতঃ ইংরাজী সাহিত্যের সাহায্যেই অবগত হইয়াছিলেন। সেই সকল সাহিত্য যে তাঁহার চিন্তা ও ভাবকে বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে লর্ড আমহার্ষ্টকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, 'ইংরাজী শিক্ষা' (ঐ বিস্তৃত অর্থে) না পাইলে, সেইরূপ পত্র লিখিতে পারিতেন না। কেবল তাহাই নহে। রামমোহন ষোল বৎসর বয়সে, এই ইংরাজী শিক্ষালাভ করিবার পূর্ব্বেই, একেশ্বরবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সত্য, কিন্তু, রঙ্গপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া, সেই মত তিনি যখন রীতিমত প্রচার আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার ইংরাজী শিক্ষাই তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য দান করিয়াছিল। তাঁহার অপর সকল প্রকারের সংস্কারের কার্য্যও (যে পরিমাণে এরূপ মহাপুরুষদিগের কার্য্যকে বাহিরের শিক্ষার ফল বলিতে পারা যায়, সেই পরিমাণে) ইংরাজী শিক্ষার ফল। যদি রামমোহনের জীবন হইতে ইহা বাদ দেওয়া যায়, তবে যাহা বাকী থাকে, তাহাতে তাঁহার বিশেষত্ব প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ইংরাজী শিক্ষা না পাইলে, তিনি নানক বা কবীরের মত একজন একেশ্বরবাদী মহাপুরুষ হইতেন মাত্র রামমোহন হইতেন না। তাঁহার প্রকৃতির ভিতর যে একটী মহান বিরাটভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমগ্র বিশ্বকে আপনার মধ্যে ধারণ করিতে ব্যগ্র। সেই বিরাটভাব ইংরাজী শিক্ষাই তাঁহাকে দান করিয়াছে। এই জন্য রামমোহনকে ইংরাজী শিক্ষার ফল বলিলে কোন দোষ হয় না।—লেখক।

আমার প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা বলিয়াছেন- -

"আমার বন্ধু যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, অনেক শিক্ষিত লোক সেই মত পোষণ করেন। কিন্তু, এই মতে অনেক ভ্রান্তি ও কুসংস্কার রহিয়াছে। সেই সকল ভ্রান্তি দূর করিয়া, আমাদিগকে স্বরাজ যদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে।

"আমার বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, ইংরাজী শিক্ষা ভারতের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলের হেতু কি না? আমি তদুত্তরে জোরের সহিত বলিতেছি, নিশ্চয়ই তাহা অমঙ্গলের হেতু। ইংরাজী শিক্ষার মধ্যে ভাল কিছুই নাই। ঐ শিক্ষা ধ্বংস করিবার জন্য আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছি। যদি ইংরাজেরা এ দেশে না আসিত, তবুও আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত অগ্রসর হইতাম। এখন যদি মোগল-রাজা থাকিত, তবে অনেকে ইংরাজী শিখিত এবং তাতে সুফলও ফলিত. কিন্তু বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগকে গোলাম করিতেছে।

"আমার বন্ধু বলিয়াছেন, ইংরাজী শিক্ষা অনেক মহাপুরুষ উৎপন্ন করিয়াছে, তিনি রামমোহন, তিলক ও তৎসঙ্গে আমার নামও উল্লেখ করিয়াছেন। আমি অতি ক্ষুদ্রলোক (pigmy), আমার কথা ছাড়িয়া দিন। রামমোহন ও তিলক যে ইংরেজী শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করি না, রামমোহন রায়কে আমি অতিশয় শ্রদ্ধা করি এবং তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া মনে করি, তিলককেও আমি ভক্তি করিয়া থাকি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রামমোহন, তিলক যদি ইংরাজী শিক্ষালাভ না করিতেন, তবে তাঁহারা যে আরও অধিকতর মহত্ত্ব লাভ করিতেন না, তাহার প্রমাণ কি? ইংরাজী শিক্ষা না পাইয়া, আমাদের দেশে এমন সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদিগের তুলনায় রামমোহন বা তিলককে অতিক্ষুদ্র বামন (mere pigmies) বলিলেই হয়। শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের তুলনায় রামমোহন ও তিলক অতীব নগণ্য। একা শঙ্কর যাহা করিয়াছেন, সমস্ত ইংরাজী শিক্ষিত লোক একত্র হইয়া তাহা করিতে পারে নাই। গুরুগোবিন্দ কি ইংরাজী শিক্ষার ফল? ইংরাজী-শিক্ষা প্রাপ্ত লোকদিগের মধ্যে কি এমন একজনও আছেন, নানকের সঙ্গে যাহার তুলনা করা যাইতে পারে? নানক এমন এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছেন, যাহার লোকেরা সাহস ও আত্মোৎসর্গের জন্য অদ্বিতীয়। রামমোহন রায়ের শিষ্যদের মধ্যে কি এমন একজনও জন্মিয়াছেন, যাহার সহিত স্বদেশ বীর দলীপ সিংহের তুলনা করা যাইতে পারে? আমি রামমোহন ও তিলককে শ্রদ্ধা করি। আমার বিশ্বাস, তাঁহারা যদি ইংরাজী না জানিতেন, তবে চৈতন্যের মত মহত্তর কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন। যদি ভারতবাসীকে জাগাইতে হয়, ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা হইবে না। হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃত না জানাতে আমি যে কি ধনে বঞ্চিত হইয়াছি, তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগকে মনুষ্যত্বহীন করিয়াছে ও আমাদিগের বুদ্ধিকে খর্ব্ব করিয়াছে। ইংরাজের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবাসী দাস ছিল না। মোগলের অধীনে আমাদের একরকম স্বরাজ ছিল। আকবরের সময় প্রতাপ ও আরংজীবের সময় শিবাজীর উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল। দেড়শত বৎসরের ইংরাজের শাসনে কি কোনও প্রতাপ

বা শিবাজী জন্মিয়াছেন। কিন্তু আমি ইংরাজী-শিক্ষাকে একেবারে ত্যাগ করিতে বলি না, যে প্রণালীতে ইংরাজী-শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, সেই প্রণালীই ত্যাগ করিতে বলি।"

মহাত্মা গান্ধী, উপরোক্ত কথা বলিয়া, তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন। তখন আমি পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"অস্পৃশ্য জাতি সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?"

তাহাতে তিনি বলিলেন—"এই বিষয়টি আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। হিন্দু সমাজের এই প্রথা অতীব নিন্দনীয়। কংগ্রেসে এই মত স্থির হইয়াছে যে, ভারত হইতে এই অস্পৃশ্যতা দূর করিতে হইবে। ইংরাজী-শিক্ষা এই প্রথাকে দূর করিতে সমর্থ হয় নাই। আমরা যখন স্বরাজ লাভ করিব, তখন তাহা দূর করিব।

"আমার বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, স্বরাজ পাইলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব কি না। রাজ্য এখন তো আমরাই রক্ষা করিতেছি, স্বরাজ পাইলে, তখনও রক্ষা করিতে পারিব না কেন? অবশ্যই পারিব।"

এই সময় একজন উকীল বলিলেন,—'এই অবস্থায় স্বরাজ পাইলে, দেশের অবস্থা আরও খারাপ হইতে পারে, দেশে অরাজকতা আসিতে পারে।' মহাত্মা সেই কথা শুনিয়া বলিলেন,—"তাহা হইতে পারে, বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা অরাজকতাও ভাল। আমি এই ইংরাজের সঙ্গে দীর্ঘকাল সহযোগিতা করিয়াছি, আমার মত কাজে সহযোগিতা কেহই করে নাই, কিন্তু আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, বর্তমান ইংরাজ-শাসন শয়তানের শাসন, এই শয়তানের রাজ্য ধ্বংস করিতে না পারিলে, ভারতের কল্যাণ নাই।"

এই সময় একজন শ্রোতা দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমরা জানিতে চাই, লালমোহন বাবু মহাত্মার উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি না?" এই প্রশ্ন শুনিবামাত্র মহাত্মা গান্ধী বলিলেন—"এইরূপ প্রশ্ন করা উচিত নহে, আমার বন্ধু যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন, সেই সকল বিষয় জটিল, এবং আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাও যথেষ্ট নহে। দুই এক ঘণ্টার মধ্যে এই সকল বিষয়ের মীমাংসা হওয়া সম্ভবপর নহে, ধীরভাবে এই সকল বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক।" এই কথার পরে, আমার পক্ষে, সেই সভাতে আর কিছু বলা সম্ভবপর হয় নাই। মহাত্মা তৎপরে আমার প্রশ্ন ও উত্তর, হিন্দিতে তর্জমা করিয়া ইংরাজী অনভিজ্ঞ শ্রোতাদিগকে বুঝাইয়া বলিলে, সভাভঙ্গ হয়।

আমার বক্তব্য।

মহাত্মার উত্তরে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি কিনা, অনেকেই আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই জন্য এই বিষয়ে আমার মত নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। আমি প্রথমেই বলিতেছি, মহাত্মার উত্তরে আমি তৃপ্ত হইতে পারি নাই। ইংরাজী-শিক্ষা ও ইংরাজ-শাসন ভারতের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলের হেতু (source of unmixed evil), এই কথা সত্য নহে। তাঁহার কথার মর্ম্ম-গ্রহণে আমি অসমর্থ। বর্তমান সময়ে, সমগ্র ভারতময় যে রাজনৈতিক জাগরণ, যে জাতীয়তা-বোধ দেখা দিয়াছে, পূর্ব্বে কখনও সেরূপ দেখা যায় নাই। ভারতবাসী যে একটী 'নেশন্', এই অনুভূতি ভারতের অতীত-যুগে কখনও জাগ্রত হয় নাই।

রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ, পোষ্ট আফিস, সংবাদপত্র-সর্ব্বোপরি ইংরাজী শিক্ষা, এই সকল মিলিয়া কি ভারতের রাজনৈতিক জাগরণ আনয়ন করে নাই? ভারতকে নব চেতনা দান করে নাই? ইংরাজ দীর্ঘকাল ভারতকে বহিঃশত্রু ও অন্তর্বিবাদ হইতে রক্ষা করিয়াছে, তাহারই ফলে কি আমাদের বর্ত্তমান একতাবোধ সম্ভবপর হয় নাই? এতবড় একটা সত্যকে গান্ধী মহাত্মা কেমন করিয়া অস্বীকার করিতেছেন? তিনি বলিয়াছেন, ইংরাজ না আসিলেও, ভারত, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত, অগ্রসর হইত। ইংরাজ না আসিলেও ভারতের অবস্থা যে উন্নত হইত, তাহা তিনি কেমন করিয়া স্থির করিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। তিনি প্রত্যক্ষকে ত্যাগ করিয়া, অনুমানকেই সত্য বলিয়া মনে করিতেছেন। ইংরাজ শাসনে, ইংরাজী শিক্ষার ফলে যে, ভারতে নব জাগরণ আসিয়াছে, নব উন্মেষ হইয়াছে তাহা তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। এই প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করিয়া অনুমানের উপর নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত কিনা, তাহা বুঝিয়া দেখিবার ভার, আমরা শিক্ষিত লোকদিগের উপর অর্পণ করিতেছি।

ইংরাজ না আসিলেও যে ভারত অগ্রসর হইতে পারিত না তাহার প্রমাণ কি? সাড়ে সাত-শত বৎসরের মুসলমান শাসনের কথা ভারতের ইতিহাসেই বর্ণিত আছে। মুসলমান শাসনের গুণবশতঃ নহে, দোষবশতঃই, একদিকে প্রতাপ ও অপরদিকে শিবাজীকে উদিত করিয়াছিল। আবার সেই দোষই, ইংরাজের আগমন সম্ভবপর করিয়াছে। ইংরাজ বাহুবলে ভারত জয় করেন নাই, মুসলমান শাসনের শেষ ও মারাঠা শেষ অবস্থার অরাজকতায় উৎপীড়িত হইয়া ভারত-বাসী ইংরাজকে সিংহাসন-দানে সর্ব্ব সহায়তা করিয়াছে। সেই মুসলমান শাসন যদি ভারতে অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত থাকিত তাহা হইলেও ভারত উন্নতির পথে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিত, একথা মহাত্মা গান্ধী কেমন করিয়া সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। ইংরাজ-শাসনে, প্রতাপ ও শিবাজীর অভ্যুদয় হয় নাই, সত্য কিন্তু, তাহাতে ইংরাজ-শাসনের গৌরবই প্রকাশ পাইতেছে। ইংরাজ যদি মুসলমানের মত হইত, তবে যে বহু শিবাজীর অভ্যুদয় হইত না, তাহা কে বলিতে পারে?

আমার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে মহাত্মা কিছুই বলেন নাই। কেন বলেন নাই, তাহা আমি জানি না। এই সকল বিষয়ে যদি তিনি কিছু বলিতেন, তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইত যে, এমন সুদীর্ঘ পরাধীনতার ইতিহাস জগতে আর নাই। গ্রীক্, শক হুন, কুশান, পাঠান, মোগল, ডচ্, ফরাসী, ইংরাজ, যখন যে আসিয়াছে, তখনই তাহারা এদেশে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছে। ভারত কদাচিৎ বিদেশীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। এরূপ দুর্গতির কারণ কি? এমন দুর্গতির ইতিহাস জগতে কি আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়? ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই দুর্গতির মূল কারণ বাহিরে নহে, ভিতরে। ভারত-সমাজের গঠন-প্রণালীর মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহাতে ভারতবাসীকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে, যাহাতে এক 'নেশনে' পরিণত হইতে দেয় নাই, এবং যাহার ফলে, ভারত চির-পরাধীন। সেই কারণ প্রধানতঃ হিন্দুসমাজের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। হিন্দুর বর্ণাশ্রম প্রথমতঃ ভেদবুদ্ধি ও তৎপরে ঘৃণা ও বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধর্ম্ম, হিন্দুসমাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছে। ফলে, ভারত-সমাজ ছিন্ন-ভিন্ন

হইয়া রহিয়াছে। একতার দৃঢ়বন্ধনে ভারত সমাজ কোনকালেই আবদ্ধ হয় নাই; ভারত কোন কালেই 'নেশন্' হয় নাই। হিন্দুরা এই বিচ্ছিন্নতাকেই হিন্দুত্ব মনে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। বর্ণাশ্রম বিভাগের উপর হিন্দুর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, দেশ হইতে তাহাকে দূর করা অতিশয় কঠিন হইয়াছে। কারণ, ধর্ম মানবহৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম দান, মানুষ সহজে ধর্মকে ত্যাগ বা সংশোধন করিতে সমর্থ হয় না। প্রকৃত ধর্মের কাজ, মানবকে মুক্তিদান করা, ক্ষুদ্রতার গণ্ডী হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহাকে উদার প্রেমের ভূমিতে লইয়া যাওয়া। কিন্তু, ভারতে বর্ণাশ্রম, ক্ষুদ্রতাকেই আশ্রয় করিয়াছে, লোকেরা ইহাকে প্রাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, সেই জন্যই সে ভারতকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সকল দেশেই এমন এক একটা সময় আসে, যখন ধর্মান্ধতার সঙ্কীর্ণতা দেশের উন্নতির ব্যাঘাত ঘটায়। সেই সময়, সেই সঙ্কীর্ণতাকে ভাঙ্গিয়া যাহারা অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে তাহারাই কল্যাণ-লাভ করিয়াছে। ইউরোপের ইতিহাস তাহাই প্রমাণ করিতেছে। আমরা আজ পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমের সংকীর্ণতা দূর করিতে সমর্থ হই নাই। সেই জন্যই আমাদের দুর্গতির অন্ত নাই। যতদিন এই অন্ধতা ও সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী হইতে ভারত মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ না হইবে, ততদিন তাহার দুর্গতি ঘুচিবে না। ইংরাজি শিক্ষা সেই শক্তির বীজ আনয়ন করিয়াছে। ইংরাজি সাহিত্য ভারতবাসীর মনকে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী হইতে মুক্ত করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন-রীতি অনুসারে সংস্কৃত শিক্ষাও প্রচলিত আছে। বহু টোল, মঠ ও আশ্রমে এই শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে। সংস্কৃত শিক্ষিত ও ইংরাজী শিক্ষিত লোকের মধ্যে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে মত ও আচারের যে প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এই দেশের এত ক্ষতি করিয়াছে, ইংরাজি শিক্ষা তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, আর, প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষা, যতদূর তাহাকেই ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ইংরাজি শিক্ষিত ও সংস্কৃত শিক্ষা-প্রাপ্ত লোকদিগের আচার ব্যবহার দেখিলেই এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

আমি বলিয়াছিলাম, ইংরাজি শিক্ষা অনেক মহৎ লোক উৎপন্ন করিয়াছে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, রাজা রামমোহন, লোকমান্য তিলক ও মহাত্মা গান্ধীর নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম। ঐ সকল লোক যে মহৎ, তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, "ইংরাজী শিক্ষা না পাইলে, রামমোহন ও তিলক যে আরও বড় হইতেন না, তাহার প্রমাণ কি?" মহাত্মার এই জবাব শুনিয়া আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি। রামমোহন, তিলক বা গান্ধী ইংরাজী শিক্ষা না পাইলে কি হইতেন, তাহা কেমন করিয়া স্থির করা যাইবে? ইংরাজী শিক্ষা না পাইলে, তাঁহারা যে নগণ্য হইতেন না, তাহারই বা প্রমাণ কি? মহাত্মা নিজে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি সংস্কৃত বা হিন্দী ভাষাতে শিক্ষিত হন নাই, সেজন্য তিনি দুঃখও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র ভারত আজ তাঁহাকে যে উচ্চ-আসন প্রদান করিয়াছে, ভারতের অতীতকালে কোনও লোকের ভাগ্যে এরূপ ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। হিন্দু তাঁহাকে ভগবানের অবতার, মুসলমান তাঁহাকে পয়গম্বর বলিয়া ভক্তি করিতেছে। আমেরিকার কোনও সংবাদপত্র তাঁহাকে বর্ত্তমান সময়ে জগতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। আরও শুনিতেছি,

যে তিনি ঋষি-শ্রেষ্ঠ টলষ্টয়ের শিষ্য, ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি টলষ্টয়ের আদর্শকেই অবলম্বন করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, ইংরাজী-শিক্ষা কি তাঁহাকে এই সম্পদ দান করে নাই? তাঁহার হৃদয়-মনকে বিকাশিত করে নাই? ইংরাজী কি তাহার জীবনে বৃথা হইয়াছে? তিনি কি তাঁহার মত ও ভাব ইংরাজী শিক্ষা হইতে লাভ করেন নাই? যে অস্পৃশ্যতাকে দূর করিবার জন্য তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন ইংরাজী শিক্ষা কি তাঁহাকে সেই বিষয়ে সাহায্য দান করে নাই? তবে, কেমন করিয়া বলিব যে, ইংরাজী শিক্ষা ভারতের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলের হেতু; যে শিক্ষা ভারতে একজন খাঁটী ইংরাজ করিয়াছে, যে শিক্ষা বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে জন্ম দিয়াছে, সেই শিক্ষা কি বিফল হইয়াছে?

এতদ্ব্যতীত, ইংরাজী শিক্ষা ভারত-সমাজের সর্ব্বত্র নিশ্চয়ই নবজীবন আনয়ন করিয়াছে। কথাটা একটু ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। বেকনের (Lord Bacon) পরে যে বিজ্ঞান-মূলক শিক্ষা ইউরোপে প্রবর্ত্তিত হইয়া তাহাকে মুক্তিদান করিয়াছে, অন্ধ কুসংস্কারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে উন্নত করিয়াছে, মধ্যযুগীয় খৃষ্টধর্ম্মের ভীষণ অন্ধকার হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে এবং নব নব বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বসকল আবিষ্কার করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছে, যাহার ফলে ইউরোপ ও আমেরিকা আজ অসীম শক্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে, বর্ত্তমান ভারতের পিতৃস্থানীয় রাজা রামমোহন, ভারতে সেই শিক্ষা-প্রবর্ত্তন করিবার জন্য, লর্ড আমহার্ষ্টকে পত্র লিখিয়াছিলেন। ভারতের হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম্ম, পুরাণ, গৃহ্যসূত্র, স্মৃতি ও দেশাচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই সকল সাহিত্য ও দেশাচারে ভারতে কি ঘটিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। জাতিভেদ, বাল্য-বিবাহ, নারীর অবরোধ ও অদ্ভুত—টিকটিকি, হাঁচি, তাগা, মালা, বৃহস্পতির বারবেলা, ডাকিনী যোগিনী ইত্যাদি,—মিলিয়া ভারতে যে অন্ধকার সৃজন করিয়াছে, সংস্কৃত বা আরবী শিক্ষাতে তাহা দূর হইবার নয়। সেই জন্য রামমোহন ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

যাহারা ইউরোপের শিক্ষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন বিজ্ঞান-মূলক শিক্ষা ইউরোপে কি মহৎ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। তাহাকে অন্ধকারের হস্ত হইতে মুক্তিদান করিয়াছে। ইউরোপের খৃষ্টানগণ ডাইনাতে (witch-craft) বিশ্বাস করিতেন। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহারা লক্ষ লক্ষ নরনারীকে জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক-শিক্ষা এইরূপ অশেষ কুসংস্কার হইতে মুক্তিদান করিয়াছে; আর সেই মুক্তির ফলে, আজ ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্য অদ্ভুত ভাবে উন্নত হইয়াছে। আমাদের দেশেও যাঁহারা এই শিক্ষার সংসর্গে আসিয়াছেন, তাঁহারাও উন্নতিলাভ করিতেছেন। এই শিক্ষার প্রভাবে, বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ স্যার জগদীশ চন্দ্র, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যগণ জগতের মুখ উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই শিক্ষা, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও জগৎ-বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবি, ও অপরদিকে, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, রমেশচন্দ্র, ও অপরাপর সাহিত্যিকদিগকে সৃজন করিয়াছে। আনন্দমোহন, তারকনাথ পালিত, সুরেন্দ্রনাথ, দাদাভাই নওরোজী, রানাডে, তিলক, গোখলে, পরাঞ্জপে, চিত্তরঞ্জন, লাজপৎ রায় প্রভৃতি মহামনা

রাজনৈতিকগণ এই শিক্ষারই ফল। আবার অপরদিকে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র শিবনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও সমাজ-সংস্কারকগণ এই শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত। এই শিক্ষা ভারতের নারী-সমাজের অবস্থাও উন্নত করিয়াছে, তরুদত্ত, রমাবাই, সরোজিনী নাইডু, সরলা দেবী, কামিনী রায় প্রভৃতি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জিজ্ঞাসা করি, এত অল্প সময়ের মধ্যে, এত অধিক সংখ্যক মহামনা লোক কি কোনও যুগে, অপর কোন শিক্ষার ফলে, ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ?

মুসলমানগণ সাড়ে সাত শত বৎসর ভারতে রাজত্ব করিয়াছে। মহাত্মা বলেন, সেই সময়, ভারত কতক পরিমাণে স্বাধীন ছিল, তাই প্রতাপ ও শিবাজীর অভ্যুত্থান হইয়াছিল। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, তাঁহারা কি ভারতকে মুক্তিদান করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন ? শিবাজীর পরেই, মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া, ধ্বংসের পথে পতিত হইয়াছিল। আর, প্রতাপের বীরত্বের ফলে, ভারতে কি স্বাধীনতা হইয়াছে, ভারতের অন্ধকারই বা কতদূর অপসারিত হইয়াছে ? শিবাজী ও প্রতাপ মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন। আর্জ কিন্তু গান্ধী মুসলমানদিগকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন। শিবাজী বা প্রতাপ কি তাঁহাকে এই শিক্ষা-প্রদান করিতেছেন ? জাতিভেদের বিষময় ফল হইতে, দেশকে কি তাঁহারা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ? অনুদার ধর্ম্মান্ধতা হইতে কি তাঁহারা ভারতকে মুক্তিদান করিয়া ছিলেন ? যদি তাঁহারা তাহা করিতে সমর্থ হইতেন, তবে আজ ইংরাজের আগমন সম্ভবপর হইত না। ইংরেজ-শাসনে শতদোষ থাকিলেও, সে ভারতে মুক্তির বার্ত্তা আনয়ন করিয়াছে, ভারতবাসীর মনের অন্ধকার দূর করিয়াছে, পুরাতনের মোহ ত্যাগ করিয়া, নবীনকে সে বরণ করিতে শিখাইয়াছে, সে তাহার চিন্তাকে স্বাধীন ও হৃদয়-মনকে মুক্ত করিয়াছে। এত বড় কাজ পূর্ব্বে কেহই করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, ইংরাজ-শাসন ও ইংরাজী-শিক্ষা ভারতের নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলই করিয়াছে ?

মহাত্মা গান্ধী একস্থানে বলিয়াছেন যে, তাঁহার শিক্ষা প্রণালীর ভিতর ইংরাজী সাহিত্যও থাকিবে। তিনি বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীরই বিরোধী, ইংরাজী সাহিত্যের বিরোধী নহেন। মহাত্মার সকল কথার অর্থ, সহজে বোধগম্য হয় না। তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী যে কিরূপ আকার ধারণ করিবে, তাহা ভারতবাসী আজিও বুঝিতে পারে নাই। সেই শিক্ষা-প্রণালীকে নির্দ্দিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া মুক্তিদান করিবার পূর্ব্বেই, তিনি বর্ত্তমান বিদ্যা-মন্দির সমূহ চূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত শিক্ষা প্রণালী যে বর্ত্তমান প্রণালী অপেক্ষা উন্নততর হইবে, তিনি তাহার কোনই প্রমাণ প্রদান করেন নাই। অগ্রে উৎকৃষ্টতর প্রণালীর শিক্ষা প্রবর্ত্তিত না করিয়া, বর্ত্তমান বিদ্যা-মন্দির সমূহকে ধ্বংস করিবার, তাঁহার কি অধিকার আছে, জানি না। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে যে দোষ নাই, তাহা কেহই বলে না। দোষ থাকিলে, তাহাকে সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও উন্নত করা আবশ্যক। ধ্বংস করিবার অধিকার কাহারও নাই। গান্ধী মহাশয় ভারতে শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করেন নাই। সেই জন্যই বা তিনি নির্ম্মম হইয়া, বর্ত্তমান শিক্ষা কেন্দ্র-সমূহকে ধ্বংস

করিতে প্রবৃত্ত হইতে বলিয়াছেন। তাহার এই বাক্যে নূতনত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু, কতদূর সমীচীনতা আছে, ভাবিবার বিষয়।

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার শিষ্যগণ দেশের প্রচলিত শিক্ষাকেন্দ্র সমূহকে ধ্বংস করিবার আবশ্যকতা প্রদর্শন করিবার জন্য, সর্ব্বদাই একটা কথা বলিয়া আসিতেছেন, সেই কথার অর্থ আমরা সহজে বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহারা বলেন, বর্ত্তমান শিক্ষা নাকি ভারত-বাসীর মনে দাসভাব (slave mentality) উৎপন্ন করিতেছে। এই slave mentality কথাটির অর্থ পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। মহাত্মা অনেক সময় বলেন—read English as an Indian nationalist would do। এই কথাতে মনে হয় যেন তিনি মনে করেন যে, ইংরাজী শিক্ষা ভারতবাসীর জাতীয়তার ভাব বিনাশ করিতেছে। এই কথা কি ঠিক? ভারতে যেমন ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী শিক্ষিত ব্যক্তিও যথেষ্ট আছেন। ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবাসীরা কি, সংস্কৃত ইত্যাদি শিক্ষা-প্রাপ্ত ভারতবাসী অপেক্ষা নিজের দেশকে কম ভালবাসেন? কাহারা ভারতে স্বাধীনতার জন্য যত্ন করিতেছেন? জাতীয় সভাসমিতি কাহারা স্থাপন করিয়াছেন? কাহারা প্রকৃত Indian nationalist? যাঁহারা Indian National Congress স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা কি Indian nationalist নহেন? আর Indian National Congress কি ইংরাজী শিক্ষার ফল নহে?

আরও একটা কথা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। শিক্ষার একটী প্রধান উদ্দেশ্য, মানবের বিচার শক্তিকে প্রখর করা, মনকে মুক্ত করা। সে যাহাতে স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া, সকল বিষয়ের ভালমন্দ সকল দিক দেখিয়া, মন্দকে বর্জ্জন ও ভালকে গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ শক্তি তাহাকে দেওয়া, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। বিচার না করিয়া, কোন বিষয় গ্রহণ করা, মানবের দাস-ভাবের (slave mentality) লক্ষণ। তাহার কথা শুনিয়া যেন এই মনে হয় যে, ইংরাজী শিক্ষা ভারতবাসীর মনের সেই বিচার-শক্তি, সেই মুক্তভাব প্রদান করিতেছে না, যাহা পাইয়া সে সকল বিষয় বিচার করিতে সমর্থ হয়, এই শিক্ষা যেন শিক্ষিত লোকের মনকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতেছে, তাহার মনে অন্ধকার সৃজন করিতেছে, পাশ্চাত্য সভ্যতার দোষ সে দেখিতে পাইতেছে না, অবিচারিতভাবে সে সকল বিষয় গ্রহণ করিতেছে। জিজ্ঞাসা করি যথার্থই কি ইংরাজী শিক্ষা ভারতবাসীকে অন্ধ করিতেছে? তবে মুক্তির বার্ত্তা ভারতে আনয়ন করিল কোন্ শিক্ষা? সংস্কৃত শিক্ষা কি ভারতবাসীকে সেই মুক্তি দান করিতেছে? বিচার না করিয়া কোন বিষয় গ্রহণ করা যদি মানসিক দাসত্বের লক্ষণ হয়, তবে ত্রিশকোটি ভারতবাসীর মধ্যে কয়জন সেই দাসত্ব হইতে মুক্ত? কয়জন ভারতবাসী ভারতের আচার, ব্যবহার, কুসংস্কার, ধর্ম্ম, সামাজিক ব্যবস্থা সকল, স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া, গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের কয়জন লোকের সেই শক্তি ও শিক্ষা আছে? স্বদেশের অশেষবিধ কুসংস্কার ও অন্ধ-ধর্ম্ম ও অন্যায় আচার ব্যবহার, অবিচারে গ্রহণ করিলে কি দাস-ভাব প্রকাশ পায় না? সেই দাসত্ব কি ভারতবাসীর অতি পুরাতন ভাব নহে? অবিচারে দেশাচারের দাস হইয়াও কি Indian nationalists হওয়া যায় না? Nationalist হইলেই

কি rationalist হয়? এই কথাই কি সত্য নহে যে, ইংরাজি শিক্ষাই কতক পরিমাণে তাহাকে বিচার-শক্তি দান করিতেছে—তাহাকে rational করিতেছে?

তিনি বলিয়াছেন "ইংরাজী শিক্ষা না পাইয়া এমন সকল লোক ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের তুলনায় রামমোহন ও তিলক অতি ক্ষুদ্র এবং নগণ্য। শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, নানক ও কবীর প্রভৃতির তুলনায়, রামমোহন ও তিলক বামন মাত্র (mere pigmies)"। মহাত্মার এই সকল কথার মধ্যে সুযুক্তির অভাব। এই স্থানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, আমি কোনরূপ তুলনা করি নাই। পুরাতন কালে, ভারতে মহামনা লোক সকল জন্মগ্রহণ করেন নাই, এমন কথাও বলি নাই, তাহাদের সঙ্গে বর্ত্তমান কালের মহৎ লোকদিগের তুলনাও করি নাই। এইরূপ তুলনা বাঞ্ছনীয় নহে। তথাপি মহাত্মা তুলনা করিয়াছেন বলিয়া, সেই বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন। তিনি বলেন, শঙ্কর বা রামানুজ, রামমোহন বা তিলক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। কি কারণে তিনি তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠতর মনে করেন, তাহা তিনি বলেন নাই, বা বলিবার আবশ্যকতা মনে করেন নাই। কেহ যদি বলেন যে, রামমোহন শঙ্কর অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ, আর তিলকের তুলনায় রামানুজ নগণ্য, মহাত্মা গান্ধীর তুলনায় নানক বা কবীর অতিশয় ক্ষুদ্র, তবে সেই কথার জবাব কি? কোন্ মাপকাঠিতে মাপিয়া, তিনি শঙ্করকে রামমোহন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা না জানিয়া, মহাত্মার এই উক্তিকে অবিচারিত ভাবে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। দুইজনের মধ্যে তুলনা হইলে, উভয়েই এক জাতীয় এবং সমসাময়িক লোক হওয়া আবশ্যক। শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই দার্শনিক, উভয়ের মধ্যে তুলনা সম্ভবপর। কিন্তু, শঙ্কর বড়, কি আর্য্যভট্ট বড়; রামানুজ বড় কি স্যার জগদীশচন্দ্র বড়, এই কথা স্থির করিব কেমন করিয়া? একজন দার্শনিক, অপরজন বৈজ্ঞানিক। এইরূপ স্থলে, ছোটবড় নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। ইংরাজী-শিক্ষার ফলে, ভারতে যে সকল মহৎলোক উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত, অতীতকালের লোকদিগের তুলনা করিতে যাইয়া, মহাত্মা এই সকল কথা বোধ হয় চিন্তা করেন নাই। তিনি অতীতকালের কয়েকজন ধর্ম্ম প্রচারকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইংরাজী শিক্ষার ফলে এইরূপ লোক উৎপন্ন হয় নাই। ইংরাজী-শিক্ষার পূর্ব্বে, ভারতে মহৎলোক জন্মগ্রহণ করেন নাই, এমন কথা কেহই বলিবেন না। কিন্তু, ইংরাজী-শিক্ষা যে সকল মহৎলোক উৎপন্ন করিয়াছে, তাঁহারা যে অতীতকালের মহৎ লোক অপেক্ষা হীন, এই কথা গান্ধী মহাশয় প্রমাণ করিতে পারেন নাই। আর তাহা বোধ হয় প্রমাণ-সাধ্যও নহে।

তাহার পর জীবন উৎসর্গ করিবার কথা, মৃত্যুকে বরণ করিবার কথা। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—"শিখ-সম্প্রদায় হইতে কত লোক ধর্ম্মার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। এখন সেই রূপ লোক দেখিতে পাওয়া যায় না; রামমোহন বা তিলক সেই রূপ লোক প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য জীবন দিতে পারে এমন লোক এখন কোথায়!"

জীবন-দান করিতে হইলে, এক দিকে জীবনদাতার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বল চাই, অপর দিকে, ভীষণ অত্যাচার ও জীবন-হন্তা চাই। খৃষ্টের লক্ষ লক্ষ শিষ্যকে ধর্ম্মের জন্য জীবন দিতে হইয়াছে। তাহার এক কারণ, খৃষ্টানদিগের প্রবল ধর্ম্মানুরাগ; অপর দিকে,

তাহাদের উপর, বিরুদ্ধ-পক্ষের ভীষণ অত্যাচার। এই দুইটী কারণ একত্রিত হইলে তবে জীবন-দান সম্ভবপর হয়। পূর্ব্বে, জগতে মানুষকে সহজেই বধ করা হইত, এখন আর সেইরূপ অত্যাচার জগতে নাই। সেই জন্যই জীবন-দানের সম্ভাবনা ও আবশ্যকতা জগৎ হইতে চলিয়া যাইতেছে। সেই জন্য martyr হওয়া এখন সহজ নহে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট, মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার শিষ্যদিগের সম্বন্ধে এখন যে উদারতা ও সহিষ্ণুতা দেখাইতেছেন, মুসলমান আমলে সেইরূপ উদারতা ও সহিষ্ণুতা সম্পূর্ণই অসম্ভব ছিল। মুসলমানের অত্যাচারেই শিখের আত্মবলিদান আবশ্যক ও সম্ভবপর হইয়াছিল। এখন ততদূর অত্যাচার হয় না। ইহাতে ইংরাজ-শাসনের গৌরবই প্রকাশ পাইতেছে। এখন মানুষকে বধ করা হয় না বলিয়া কি মনে করিতে হইবে যে, এখনকার লোকদিগের অত্যধিক বল ও নৈতিক বল নাই। রামমোহন তিলক ও গান্ধীকে শূলে চাপাইয়া হত্যা করা হয় নাই বলিয়া কি মনে করিতে হইবে যে, এই সকল মহাপুরুষদিগের জীবন-দান করিবার শক্তি ছিল না, বা নাই। স্বদেশী-আন্দোলনের সময় কি বঙ্গের যুবকগণ জীবন-দান করেন নাই। আবশ্যক হইলে কি এখনও শত শত লোক জীবন দিতে পারে না? সেই আশা আছে বলিয়াই তো গান্ধীর এই আন্দোলন সম্ভবপর হইয়াছে তাহা না হইলে তো সকলই বৃথা। তবে কেমন করিয়া বলি যে ইংরাজী-শিক্ষার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক-শক্তি লুপ্ত হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে, মহাত্মা গান্ধী স্বীকার করিয়াছেন যে, বর্ণাশ্রমের ফলে যে ছয় কোটী লোককে অস্পৃশ্য করিয়া রাখা হইয়াছে এই ব্যাপারটা হিন্দু সমাজের অতীব গুরুতর অপরাধ, এই দোষ দূর করা আবশ্যক। কংগ্রেস্ কি ইংরাজি শিক্ষার ফল নহে। কংগ্রেস কি ভারতে রাজনৈতিক জাগরণ আনয়ন করেন নাই? সাড়ে সাতশত বৎসরের মুসলমান শাসন কি ভারতে কংগ্রেসের মত জাতীয় মহাসমিতি গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইংরাজী-শিক্ষা যদি আর কিছু না করিয়া কেবল মাত্র জাতীয় মহাসমিতি গঠন করিয়াই ক্ষান্ত হইত, তাহাতেই তাহার সার্থকতা যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণিত হইত ও তাহার মহিমা ভারত ইতিহাসে চিরদিন ঘোষিত হইত। যাহা হউক, জাতিভেদের মূলে যে অত্যাচার, হৃদয়হীনতা ও স্বার্থপরতা বর্ত্তমান আছে, তাহা মহাত্মা গান্ধী জানেন। এই অত্যাচার কি ডায়ার ও ওডায়ারের অত্যাচার অপেক্ষা হীন? মান্দ্রাজের অস্পৃশ্যজাতির সংখ্যা, যাট লক্ষ। তাহারা গত নভেম্বর মাসে সভা করিয়া একবাক্যে বলিয়াছে যে, ডায়ার কয়েকজনমাত্র লোককে খুন করিয়াছে ও কয়েকজনকে বুকে হাঁটাইয়াছে, তাহাতেই মহাত্মা গান্ধী ইংরেজ রাজ্য ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের যাট লক্ষ লোককে সমাজ, শত শত বৎসর ধরিয়া, রাজপথে বুকে হাঁটিয়া যাইবারও অধিকার প্রদান করিতেছে না, মহাত্মা গান্ধী তাহার কি প্রতিকার করিতেছেন। তাহারা যে প্রস্তাবটি ধার্য্য করিয়াছে, নিম্নে তাহার কতক অংশ প্রদত্ত হইল—

"And this meeting is firmly convinced that General Dyer was an angel of mercy compared with the caste-system or *Varnashrama Dharma* which resulted in racial segregation and conseqently living death of sixty millions of men and women for so many centuries, and that Colonel Frank Johnson, who ordered Indians to crawl on their bellies through certain streets in Amritsar, was the soul of compassion

compared with those *Varnashsama Dharmists* who could not allow members of our community even to crawl on their bellies through their streets, and calls upon Mr Gandhi and his co-workers to have moral courage to remove those grosser and greater social wrongs of ages, before trying to redress lesser political wrongs of yesterday and seeking to destroy the British Government, which has been and still is, on the whole, the justest and best Government which India has or can have at the present imperfect stage of her national evolution"

উদ্ধৃত মন্তব্যটীর প্রত্যেক বাক্য কি নির্দ্দেশ করে? যে উকীল ওকালতি ত্যাগ করে নাই, রাজনৈতিক আন্দোলনে সে নায়ক হইতে পারিবে না বলিয়া মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যে জাতিভেদ ত্যাগ করে নাই, তাহার বিরুদ্ধেও তেমনি আদেশ দেখিতে চাই। যতদিন ভারতে বর্ণাশ্রম মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত না হইবে, ততদিন স্বরাজ স্থাপনের আশা, সুদূর পরাহত। গান্ধী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, বর্ত্তমান সামাজিক দুর্গতি দূর হইবার পূর্ব্বে যদি অসহযোগ-নীতির ফলে স্বরাজ লাভ করি তবে কি তাহা রক্ষা করিতে পারিব? তিনি তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীই তো এখন রাজ্য রক্ষা করিতেছে, স্বরাজ পাইলে তাহা কেন রক্ষা করিতে পারিবে না? মহাত্মার এই কথারও মর্ম্ম আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে অক্ষম। আমরাই যদি রাজ্য রক্ষা করিতেছি, তবে অসহযোগ-নীতির আবশ্যকতা কি? ইংরাজ যদি আজ চলিয়া যায়, আমরা কি বহিঃশত্রু হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারিব? পারস্য, আফগানিস্থান, চীন, জাপান কি ভারতকে আক্রমণ করিবে না? পারস্য বা আফগানিস্থান যদি এদেশকে আক্রমণ করে, তবে এদেশের মুসলমানগণ কি তাহাদের সঙ্গে যোগ দিবে না? ভারতের মুসলমান তাহাদের খলিফার জন্য যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে, তাহাতে কি ভারতের রাজনৈতিক আকাশে মেঘের সঞ্চার হইতেছে না? মুসলমান, খলিফাকে যে পরিমাণ ভালবাসে, ভারতকে কি সেই পরিমাণ ভালবাসে? হিন্দুর স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে, মুসলমান কি খলিফার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে? চীন বা জাপান আসিলে, কি ভারত আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? যে দেশের বাইশ কোটি লোক মৃতপ্রায়, যে দেশের দুর্গতির সীমা নাই, সেই দেশ, এক বৎসরের মধ্যে, স্বরাজ লাভ করিবে, এ কথা আলাউদ্দিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের গল্পের মত। শিক্ষিত ভারতবাসী এই সকল কথা ভাবিয়া দেখিবেন।

শ্রীলালমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ব্রহ্মতেজ।

সে বৎসরে,
পদ্মার দুকূলগ্রাসী বিপুল খর্পরে
সঁপি ঘরদ্বার,
বাহিরিল পথে, বিপ্র হরিদাস, সহপরিবার,
স্মরি দুর্গানাম,
—অজানা পথের যাত্রী, অসহায়, অনশনক্লাম।

দিবা দ্বিপ্রহরে।
বিশুষ্ক, বিদীর্ণ, দগ্ধ, পথল, প্রান্তর।
মাথার উপরে দীপ্যমান্
অধৃষ্য সহস্ররশ্মি, অগ্নিবর্ষী, খর বিবস্বান্,
সমুজ্জ্বল Monocle ধূর্জটির ললাট নয়নে।
ব্যথিছে চরণে

রৌদ্রদীপ্ত, তপ্তবালু, রাজবর্ত্ম খরক্ষুরধার।
মুহ্যমান জগত সংসার,
বিশাল অম্বরে নাহি বারিবিন্দুলেশ,
জন-কোলাহল-শূন্য বিস্তৃত প্রদেশ—
বিরল বসতি
দিগন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রে নাহি ছায়া, নাহি বনস্পতি
শুধু মাঝে মাঝে,
দু-চারিটা তালতরু নিস্পন্দ বিরাজে,
মধ্যাহ্ন আলোকে
প্রকট বিস্ময় চিহ্ন ছায়ান্বেষী পথিকের চোখে।

অনভ্যস্ত শুষ্ক শ্রম, তাহে অনাহার।
সুখের কোমল ক্রোড়ে লালিত, পালিত সুকুমার
কয়টা পরাণী
বিষম দুর্গম পথ কেমনে বাহিবে নাহি জানি
ব্রাহ্মণীর রোগাবস্থ দেহযষ্টিখানি
ভাঙ্গি পড়ে পড়ে
কণ্ঠে লগ্ন অবসন্ন শিশুকন্যা, না নড়ে না চড়ে
স্খলিত জড়িত গতি তন্দ্রালস তিনটি বালক,
নাবালক।
বিক্ষত চরণ হতাশ্বাস
হরিদাস
অগত্যা নিকটে গৃহ দুটীর নেহারি
দাঁড়াইল দ্বারদেশে দিবসের আশ্রয় ভিখারী।

গৃহস্বামী ফকির মণ্ডল,
কৃষিবল,
মাঠ হতে কিছুক্ষণ ফিরিয়াছে ঘরে,
জ্বলন্ত উদরে
এখনো পড়েনি অন্ন, শুষ্ককণ্ঠে পড়ে নাই জল,
ঘর্ম্মধারা মুছে নাই অঙ্গ হতে, পরাণ বিকল
ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, অবসাদে।
বচসা করিতেছিল, পত্নীসনে নিরত বিবাদে।
সহসা বাহিরে
হেরি পথশ্রান্ত অতিথিরে,
ভুলে গেল আপনার ব্যথা,
কলহের কথা
নিবায়ে জঠর বহ্নি, শান্ত করি অন্তরের দাহ,
প্লাবিল দু-আঁখি তার বুকভরা করুণা-প্রবাহ।

ছুটে এসে
ভূমিতে ঠেকায়ে মাথা, প্রণমিল চরণ উদ্দেশে,
সকলেরে ভক্তি-নত শিরে,
গলবস্ত্রে, করযোড়ে, আমন্ত্রিল দরিদ্র কুটীরে।
বসাইল রোয়াকের ছায়ে
মাদুর বিছায়ে,
দুলাইল ঘন ঘন তালবৃন্ত, শ্রান্তি অপহারী,
আনি দিল সুশীতল বারি,
পান, চূণ, খদির, গুবাক,
নতন কলিকা ভরি সাজিল তামাক,
কলাপাতে বানাইল নল,
সুবিমল,
গোশালা মার্জ্জনা করি একপ্রান্তে পাতিল উনান
জোগাইল রন্ধনের যত অনুষ্ঠান,
আনি দিল কাঠ, পাতা, তেল্‌নুন, দুগ্ধ ঘৃত ডাল,
মোটাচাল,
কৃষকের রুধিরক্তে রক্তিম সে,
পুষ্ট শ্রদ্ধাবসে।—
সমর্পিল রিক্ত-প্রায় করিয়া ভাণ্ডার
দীন উপহার।
কিন্তু তাহে শান্তি নাহি মানে,
ছুটে গেল গ্রামান্তরে ফলমূল আদির সন্ধানে।
বাড়াইতে অতিথির সুখ
সকলই সঁপিতে চায়, চিত্ত উন্মুখ,
স্বার্থে নিরমম
নবজাত শিশু লাগি মাতৃস্তন সম।

গত-প্রায় দিন।
হরিদাস সপুত্রক সবেমাত্র আহারে আসীন,
সফেন, সবাষ্প অন্নে তখনো আতপ্ত কলাপাত,
এমন সময়ে অকস্মাৎ—
দু-চারিটা ডাব হাতে, উৎফুল্ল ফকির
একেবারে সম্মুখে হাজির।

ব্রাহ্মণেরে তদবস্থ হেরি
তখনি পালাল কিন্তু, ক্ষণমাত্র না করিয়া দেরি।
বৃথা চেষ্টা হায়!
কৃষকের ঘন কৃষ্ণকায়
জাগাইল ক্ষিপ্রগতি বজ্রবহ্নি বিপ্রের মাথায়!

অধমের স্পর্দ্ধা স্মরি ক্রুদ্ধ হরিদাস
টানিয়া ফেলিতে চায়, সেই দণ্ডে, তণ্ডুলের রাশ।

ব্রাহ্মণী অমনি তার হাত চাপি ধরে,
বলে সকাতরে—
"রক্ষা কর, দেহে তব সহিবে না এত অবহেলা
পড়ে এল বেলা,
শীর্ণকায়
পথশ্রমে বিগলিত প্রায়,
দুই দিন গেছে উপবাস,
মাথা খাও, ছেড়ো না ক এ সময়ে মুখের গরাস।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ব্রাহ্মণ
দেখাইল যেই পথে ফকির করিলা পলায়ন।
কহিলা ব্রাহ্মণী—
"তাহাতেও দোষ নাহি গণি,
শূদ্র নরাধম
আসিয়াছে নেত্রপথে, সত্য বটে, হারাবে সংযম,
কিন্তু সে ত নিমেষের তরে।

চেহারা তাহার কিছু আঁকা নাই তোমার অন্তরে।
মনে কর এসেছিল পথের কুক্কুর,
দুয়ারে মারিয়া উঁকি, তাড়া খেয়ে হয়ে গেছে দূর।
কুক্কুর (ই) বা ভাবিবে না কেন?
শৃগাল কুক্কুর হতে অন্ত্যজের প্রভেদ কি হেন?"
কহে বিপ্রবর—
"মিছা তর্ক কর, প্রিয়ে, নাহি রাখ শাস্ত্রের খবর।
'ছোটলোক কুত্তার সামিল', লোকে কহে,
সত্য তারা কুত্তা কেহ নহে।
কুকুর বিড়াল হলে নাহি ছিল ক্ষতি,
এ যে গো মানুষ। এই কুসক দুর্ম্মতি,
হাসে, কাঁদে, কথা কয়, চিন্তা করে ইহ পরকাল
ব্যথারে এড়ায়ে চলে সুখের কাঙাল,
অপমানে ভাঙি, পড়ে, আদরে পলকে যায় গলি,
স্বার্থে হয় আত্মহারা, পরঅর্থে দেয় আত্মবলি,
শোকে বাষ্পভরাকুল, হর্ষে করে অশ্রুবিসর্জ্জন,
বিধাতার অপূর্ব্ব সৃজন!

অন্তরেতে নারায়ণ
চির-বিরাজিত।
কিন্তু হায় স্কন্ধে নাই যজ্ঞ উপবীত
বিষ্ণু-ভরা parcel। হইলে কি হয়?
মোটেই যে সুতাবাঁধা নয়।
ষ্ট্যাম্প্ চিহ্ন-হীন যেন দলিল এ দু-লাখ টাকার।
একেবারে অস্পৃশ্য, অসার।
হেন নরে নিরখি সম্মুখে,
ভাতগুলা গিলি কোন্ মুখে?"

"কেন ক্ষতি কিবা?
কলিকালে কেবা বল শাস্ত্র মেনে চলে নিশিদিবা?
ইহা ছাড়া,
আপদ সময়ে শাস্ত্র মানিবার নাহি কোনো তাড়া।
নাচারের অনাচারে দোষ কেবা বাছে?
কথাইত আছে
'ঔষধার্থে সুরাপান।
না হয় ওষুধ বলে,—ক্ষীণ তুমি, রোগীর সমান,
একমুঠো ভাত দাও পেটে,
প্রায়শ্চিত্ত কোরো পরে।
এত করে
রাঁধিলাম খেটে,
ফেলে দিয়ে চলে যাবে? প্রাণে তব নাহি দয়া, মায়া?"
বলিতে লাগিল বিপ্রজায়া।

হরি কহে "আরে রহ রহ
কি যে ছাই বাতুলের মত কথা কহ।
আজিকে পূজিব শাস্ত্র, কাল তারে দিব জলে ফেলে,
একি তুমি ছেলে খেলা পেলে?
তুমি কি বলিতে চাও, শুনি?
যত ঋষি মুনি,
সবাই ছিলেন তাঁরা গাঁজাখোর নাকি?
বিশ্বজনে দিয়েছেন ফাঁকি,
রচি দুটো মিথ্যা-ভরা শাস্ত্রের বচন?
শূদ্রের লোচন
বর্ষিছে সহস্র বারি
বিষময় বিষম চৌম্বুক-শক্তি। জান কি তা, নারি?
যার সাথে মিশে
প্রাণময় অন্ন হয় পরিণত বিষে,
এবং তা খেলে পরে হতে পারে শরীর খারাপ!
বাপ্!
আমি কি করিতে পারি হেন মহাপাপ!"

ব্রাহ্মণী ভনয়,—
"শরীর খারাপ হয়।
হলই বা কিছু।
না খেয়ে শুকিয়ে ম'লে এমনি বা পিছু
শরীর কি ভাল হবে?
মিছা তবে
কেন বা ভোগাও?
অল্প কিছু খাও।
ছেলেরা খেতে পাবেনা অন্ন, তুমি যদি উপবাসী থাব,
শাস্ত্র এবে রাখ,
কেন আর বধ কর অকারণে এতগুলা প্রাণী।"

উত্তরিলা দ্বিজোত্তম,—ধীরোদাত্ত বাণী।—
"প্রেয়সি এ অসম্ভব।
যায় যাক্ সব,
যায় যাব বন্ধুজ্ঞাতি, কুটুম্ব, আত্মীয়।
যায় যাক্ ধনজন, বিত্ত হতে প্রিয়
সম্ভ্রম সম্মান।
যাক্ প্রাণ।
যায় যাক্ পুত্র কন্যা, প্রাণের অধিক,
সুখে সাথী অমৎসর, দুঃখের সরিক,
ধর্ম্মে গুরু, কর্ম্মে মন্ত্রী, নর্ম্মে সখী সখা,
ভার্য্যা প্রিয়তমা
যায় যদি যাক্।
সহ্য করে রহিব নির্ব্বাক।
কিন্তু শাস্ত্র ভঙ্গ করা। হে ব্রাহ্মণি,অসাধ্য আমার।

শুনি সমাচার
পালিবারে একাদশী, (অবশ্য সে শাস্ত্রের
খাতির,)
স্বহস্তে কাটিলা নিজ সন্তানের শির
রাজা রুক্মাঙ্গদ।
শাস্ত্ররূপ অমূল্য সম্পদ
রক্ষা করিবারে,
আমিও মরিব, আর মারিব সবারে
—অনাহারে।

উঠিলেন বিপ্রবর। ভূমিতে লুটাল ছেলেগুলা।
পশ্চিম বনান্ত পারে নিবে গেল দিবসের চূলা।
অকস্মাৎ ছুনয়নে বসুন্ধরা অন্ধকার হেরে
ফুটি উঠে লক্ষতারা, স্বেদবিন্দু, নভোভাল ঘেরে
নিস্তব্ধ প্রকৃতি শুধু শান্তিহারা ঘুরে সান্ধ্যবায়,
বংশ-বন মর্ম্ম মাঝে বহিয়া বহিয়া গুমরায়
'হায়, হায়। হায়, হায়। হায়, হায়। হায়।

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

উপাধি রহস্য।

[প্রথম প্রস্তাব]

ভাষা দ্বিবিধ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অতি আদিম যুগে যখন মানব তাহার "ব্যক্ত ভাষার" সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই তামস-যুগে পূর্ণ "ভাষা জ্ঞানের" অভাবে, সে অন্যান্য সৃষ্ট-বস্তুর উপাধি প্রদানে বা নামকরণে সম্পূর্ণ অপারগ ছিল। পরে যখন তাহার ভাষা-জ্ঞান বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং নিত্য নূতন নূতন শব্দ দ্বারা ভাষা জননীর উৎকর্ষ-সাধনে প্রবৃত্ত হইল সেই শুভ-মুহূর্ত্ত হইতে, পার্থক্য বুঝাইবার নিমিত্ত, যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর পৃথক পৃথক "উপাধি প্রদান" বা "নামকরণ" করিতে আরম্ভ করিল, একই মানব সমাজকে নানাবিধ উপাধি প্রদান করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। এই পার্থক্য সংসূচিত করাই "উপাধি প্রদানের" এক মাত্র নিয়ামক বা মুখ্য উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমরা দেখিব যে মানব

সমাজে যে নানাবিধ উপাধি প্রদান করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। এই পার্থক্য সূচিত করাই "উপাধি প্রদানের" এক মাত্র নিয়ামক বা মুখ্য উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমরা দেখিব যে, মানব সমাজে যে নানাবিধ উপাধির প্রচলন রহিয়াছে, উহা কি ভাবে আমাদের সমাজের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। "উপাধি রহস্য" সম্যক্‌রূপে উদ্ঘাটন করা, আমার ন্যায় অল্প-বুদ্ধি লেখকের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব কার্য্য হইলেও, বামন হইয়া চাঁদ ধরিব, এই ইচ্ছা বলবতী হওয়ায়, অদ্য এই বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। জানি না, পাঠকের মনোরঞ্জন, করিতে সমর্থ হইব কি না।

১। মানবেতর জীব বা বস্তুর নামানুসারে, প্রাচীন আর্য্য-সমাজে উপাধি প্রদান প্রচলন হয়। তাই আমরা আমাদিগের বেদাদি প্রাচীন শাস্ত্র সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, পূর্ব্বকালে, ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে মানবেতর জীব—অর্থাৎ বানর, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গো, মহিষ, পক্ষী, হংস, ময়ূর, নাগ বা সর্প—এবং অন্যান্য সৃষ্ট-বস্তু অর্থাৎ, সূর্য্য, চন্দ্র, বন বা অরণ্য প্রভৃতি উপাধি-বিশিষ্ট লোক বর্ত্তমান ছিল। মানব-সমাজে উপাধি প্রদানের ইহাই আদিম প্রথা। এই উক্তির সমর্থন জন্য ও আপনাদের অবগতির জন্য আমরা শাস্ত্রাদি হইতে কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। জগন্মান্য সামবেদ বলিতেছেন—

"প্রহং সাসস্তৃপলা বগ্নু গচ্ছ
অমাদস্তং বৃষগণা অয়াসুঃ।—সামবেদ ৮০৩ পৃ। তত্র সায়ণ ভাষ্যং—হংসাসঃ শত্রুর্ভিস্তমানা হংসাইব আচারন্তো বা বৃষগণা এতন্নামকা ঋষয়ঃ অমাৎ শত্রূনাং ত্রাসিতাঃ সন্তঃ অস্তং যজ্ঞ গৃহং প্রাযাস্থঃ প্রগস্থন্তি।

অর্থাৎ, যাহারা শত্রুকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াও, প্রতিহিংসা না করিয়া, হংসের ন্যায় সহ্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নাম "হংস"। তাহারা, অথবা "বৃষাস্য" ঋষিরা শত্রু দ্বারা ত্রাসিত হইয়াও যজ্ঞ গৃহে গমন করেন।

তথাহি ভাগবতম্—
"আদৌ কৃতযুগে বর্ণোন্থণাং হংসইতি স্মৃতঃ।"

একারণে, এখনও আমরা সাধু লোকদিগকে "হংস" বা "পরমহংস" উপাধিতে বিভূষিত করি। হরিবংশ প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহে ও বিবৃত রহিয়াছে—"দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ। শিষ্টাঃ সোমায় রাজ্ঞেহথ নক্ষত্রাখ্যা দদৌ প্রভুঃ॥ তাসু দেবাঃ খগা নাগা গাবো-দিতিজদানবাঃ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাশ্চৈব জজ্ঞিরেহন্যাশ্চ জাতয়ঃ॥ ৫৯—১অ। প্রজাপতি দক্ষ, আপনার ষাট কন্যার মধ্যে সাধ্যা প্রভৃতি দশটী কন্যা প্রজাপতি ধর্ম্মকে, অদিতি ও দিতি প্রভৃতি ত্রয়োদশটি কন্যা কশ্যপকে এবং নক্ষত্র নামা অবশিষ্ট সাতাইশ কন্যাকে চন্দ্র-বংশের আদি মহারাজ সোম বা চন্দ্রকে প্রদান করেন। তাঁহাদিগের গর্ভে দেব, দানব, দৈত্য, খগ বা পক্ষী, নাগ বা সর্প, গো বা বৃষভ আখ্যাধারী দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাগণ জন্ম-গ্রহণ করেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—

সর্পা হৈ এতৎ সত্র মাসত।

গাজে বৈ এতৎ সত্র মাসত॥

অর্থাৎ, সর্প বা সর্প-উপাধি-বিশিষ্ট এবং গোগণ বা গো-আখ্যাধারী মানবগণ এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

অবশ্য আপনারা প্রশ্ন করিবেন যে বেদাচার্য্য পূজ্যপাদ সায়ণ তাঁহার ঋগ্বেদ ভাষ্যের ভূমিকায় এই সকল মন্ত্র তুলিয়া দিয়া বলিয়াছেন—

নমু বেদে ক্বচিৎ এবং শ্রূয়তে বনস্পতয়

সত্র মাসত সর্পা মাসত ইতি।

তত্র বনস্পতীনাং অচেতনত্বাৎ সর্পানাং চেতনত্বেঽপি

বিদ্যারহিতত্বাৎ ন তদনুষ্ঠানং সম্ভবতি।

বনস্পতিদিগের চেতনা নাই বলিয়া এবং সর্পাদিগের চেতনা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যাহীনতার জন্য যজ্ঞ-অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে। মহাত্মা সায়ণাচার্য্যের এই অভিমত অবশ্য খুব যুক্তিযুক্ত (rational), তদ্বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই, তবে আমরা ইহাতে সম্পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করিতে পারিলাম না। কেন? এখানে "সর্প" অর্থ বিষধর সর্প নহে পরন্তু "সর্প" উপাধি-বিশিষ্ট মানব শ্রেণী এবং "বনস্পতি" শব্দের অর্থ "বন" বা "অরণ্য" উপাধি-বিশিষ্ট মানবদিগের রাজা এরূপ অর্থের বিনিয়োগ করিলে আরও যুক্তিযুক্ত হইত এবং লক্ষণাদি উদ্ধৃত বচনের সহিত বেশ সামঞ্জস্য থাকিত। মহাত্মা সায়ণাচার্য্যের উপর দোষারোপ করিয়া কেন আমরা এরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে সমুৎসুক? কারণ, প্রাচীনকালে 'সর্প' বা 'নাগ' উপাধির লোক ছিলেন, তাঁহারাই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেন। এখনও "নাগ" উপাধির লোকের অভাব নাই। 'সর্প' উপাধির লোক যে তদানীন্তন যুগে বর্ত্তমান ছিল, মহাত্মা ব্যাসদেবের উক্তিই ইহার সমর্থন করে। তিনি বলিয়াছেন যে—

পুত্রোঽয়ং মম সর্পাৎ জাতঃ

মহা তপস্বী স্বাধ্যায় সম্পন্নঃ।

আমার এই পুত্রটী আমার সর্পজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে সমুৎপন্ন। এ অতি মহা তপস্বীঃ ও অতীব স্বাধ্যায়-সম্পন্ন। বলা বাহুল্য যে, বিষধর সাপের পেটে মনুষ্যের তপঃ স্বাধ্যায়-সম্পন্ন বেদজ্ঞ সাপ জন্মিয়া থাকে না। পরীক্ষিতকে যে সর্পে নিহত করিয়াছিল, আমরা মনে করি, তিনি এই "সর্প" উপাধিধারী কোন ব্যক্তির দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন। আর, বর্ত্তমান সময়ে, 'বন' বা অরণ্য প্রভৃতি উপাধি সাধু এবং মঠের মহান্তদিগের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই।

৩। আমরা আর অধিক প্রমাণ অধ্যাহৃত না করিয়া, কেবলমাত্র দুই একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, আমাদের বক্তব্য বিষয়টী পরিস্ফুট করিব। হরিবংশের অন্যত্র বিবৃত রহিয়াছে—

শকা যবন কাম্বোজাঃ পারদাশ্চ বিশাম্পতে।

কোলি সর্পা মহিষাশ্চ দার্দাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ॥

সর্ব্বেতে ক্ষত্রিয়া তাত ধর্ম্মস্তেষাং নিরাকৃত।

বশিষ্ঠ বচনাৎ রাজন্ সগরেণ মহাত্মনা॥ ১—১৪

হে মহারাজ! শক, যবন, কম্বোজ, পারদ, কোলি, সর্প, মহিষ, দরদ, চোল এবং কেরল-গণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। মহারাজ সগর বশিষ্টের বচনানুসারে ইহাদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করেন। বোধ হয়

এখানে উল্লেখ করিলে, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, এই মানুষ মহিষ' বংশেরই দলপতি মহিষাসুর দেবীযুদ্ধে দেবীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের বিবৃতি ও এ বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করে। * কিন্তু পরে ভ্রান্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমরা সেই মানুষ-মহিষে লেজ, শৃঙ্গ দিয়াছি, ইহাতেও পরিতুষ্ট না হইয়া, দেবীর খড়্গাঘাতে সেই সেনাপতি পরুষ মহিষটার পৃষ্ঠদেশ দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহারই জরায়ু-শূন্য উদর হইতে একটা খড়্গপাণি মনুষ্য বালক বহির্গত করিয়াছি? (মার্কণ্ডেয় পুরাণের শেষাংশের বিবৃতি দ্রষ্টব্য।)

যাহা হউক, এতক্ষণ আমরা পুরাণাদি শাস্ত্র বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম যে, মানবেতর জীব বা বস্তুর নামানুসারে মানব-সমাজের "উপাধির' প্রচলন হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা আমাদের ঐতিহাসিক-গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ করিব।

"এই সময়ে নাস্তিক মতের অত্যন্ত প্রাবল্য হওয়াতে বৈদিক-ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন-প্রায় হইয়াছিল। তারপর, ময়ূর বংশের ধ্রুবধ্বজ অবধি রাজপাল পর্য্যন্ত ৯ জনেতে ১১৮ বৎসর * * * ৫ পৃষ্ঠা। রাজাবলী।

বর্ত্তমান সময়েও যে ঐ সকল উপাধিমান লোকের অভাব আছে, তাহা নহে। "সিংহ" উপাধি ক্ষত্রিয়, রাজা, কায়স্থ, উগ্রক্ষত্রিয়, এবং তাম্বলিক প্রভৃতি জাতিতে বর্ত্তমান। কৈবর্ত্ত-গণের মধ্যে "হাতী", এবং কায়স্থদিগের মধ্যে "বাঘ" উপাধি প্রচলিত। পাবনা ও রাজসাহী প্রভৃতি অঞ্চলে, "ভেড়া" ও "পাঠা" উপাধির লোক এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বরিশালের নমঃশূদ্রগণের মধ্যে "মহিষ" উপাধি রহিয়াছে। রঙ্গপুরে 'শিয়ালু" মৈকালু" উপাধির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার কায়স্থ বৈদ্য জাতির মধ্যে "নাগ" উপাধি ছিল, এখনও গন্ধবণিকদিগের মধ্যে 'নাগ" উপাধির বহুল প্রচলন রহিয়াছে। চন্দ্র, নদী গিরি, পর্ব্বত উপাধি-বিশিষ্ট লোক যথেষ্ট রহিয়াছে, তাহাও আপনাদের অবিদিত নাই। মুসলমানদিগের মধ্যেও "সের" "বাজ" (শ্যেন পক্ষী) বখ্‌রা প্রভৃতি নামের অভাব নাই। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যেও Lion, Fox, Elephant, Lamb, Sheep Bull, Bullock, Hog, Peacock, Patridge, Bird, Wood, Hill, Mountain প্রভৃতি উপাধির বহুল প্রচলন রহিয়াছে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই উপাধিগত সাম্য সেই আদিম প্রথার সূচনা করিয়া দিতেছে। মানবজাতি যে "এক নিদান সম্ভূত" এই উপাধি-রহস্য সম্যক-রূপে উদ্ঘাটন করিতে পারিলে, ইহা আমরা কতকটা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষে এই মহতী কার্য্য সম্পাদন করা সম্ভবপর নয়। তবে ভবিষ্যতে, ভারতে চাতুর্বর্ণ্য-প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে উপাধিগুলি কিরূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়া, সমাজে প্রসার লাভ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। সে যাহা হোক, উপরিউদ্ধৃত প্রমাণের দ্বারা আপনারা এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, মানবেতর প্রাণী বা অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর নামানুসারে মানব-সমাজে উপাধি প্রচলন হইয়াছিল।

শ্রীললিতমোহন রায়।

---

* ষষ্ঠতমে দৈত্যপতে কেশরে নগরোত্তমম্ * * * নগরং মহিষস্য চ।

নববধূ-বরণ।

এস লক্ষ্মি! বধূরূপে বরিয়া তোমায়
পরাই সিঁদুর রেখা ললাটে সীঁথিতে,
প্রকোষ্ঠে 'এয়োতি' চিহ্ন লোহের বলয়।
চিরজন্ম পর ইহা মাগি বিভুপদে।

এস সখি সাথে লয়ে শ্রেষ্ঠ আভরণ—
শীলতা, সতীত্ব, দয়া, তিতিক্ষা সন্তোষ।
সুখী হ'তে সুখ দিতে এসো সাথী করে
প্রাণ ভরা স্নেহ আর ঈশ্বরে বিশ্বাস।

ভগ্নপ্রাণ ক্ষীণ দেহ পিতা আমাদের
মাতৃহারা আমরা যে স্নেহের ভিখারী,
সেবিও শ্বশুরে যত্নে, তুষিও স্বজনে
দেবর ননদ আর যত নরনারী।

সৌভাগ্য, সম্পদ, সুখ উঠুক উথলি
পরমেশ পদে আজি এই ভিক্ষা করি।

শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ।

"কোচবেহার" প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা নব্যভারতে প্রকাশিত "কোচবেহার" প্রবন্ধে অনেক ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হয়। নিম্নে কতকগুলির লিপিবদ্ধ করা হইল।

৬৩ পৃষ্ঠার ভ্রম—

"বক্তিয়ারের পুত্র মহম্মদের কামরূপ আক্রমণ কালে, কোচবেহার রাজ্য আসামের অধীন ছিল।"

এই উক্তির কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। তখন আসাম বলিয়া কোন দেশ ছিল না। আহম বংশীয় রাজগণের আধিপত্য সে সময় বর্ত্তমান আসামে স্থাপিত হয় নাই। "কোচ বিহার" নামকরণও তখন পর্য্যন্ত হয় নাই।

৬৪ পৃষ্ঠার ভ্রম—

"তিনি (যে ব্রাহ্মণ কামতাপুরে ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) পরে কোচবেহারের একজন প্রধান জমিদার হইয়াছিলেন।"

গোবরাছড়ার মুস্তফী মহাশয়দের একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী ঐ ধন প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ কোচবেহার ত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কোচবেহারের কেহই আর তাঁহার সংবাদ রাখেন না। তাঁহার জমিদার হওয়ার কথা অশ্রুত পূর্ব্ব।

"কোচবেহার রাজবংশের সভা-পণ্ডিত কোনও ব্রাহ্মণ-রচিত যোগিনী-তন্ত্র নামক তন্ত্রে এই সমস্ত বর্ণিত আছে।"

যোগিনী-তন্ত্র শঙ্করাচার্য্য কাপালিক বিরচিত। শঙ্করাচার্য্য কাপালিক কোচ বেহারের কোন রাজার সভা-পণ্ডিত ছিলেন, ইতিহাসে এরূপ কোথাও প্রকাশ নাই।

"বিশ্ব সিংহের দুই পুত্র, মহারাজা নরনারায়ণ অপর নাম মল্ল এবং শুক্লধ্বজ বা চিলা রায়।"

কোচবেহারের ইতিহাসে (রাজোপাখ্যান) বিশ্বসিংহের তিন পুত্র এবং দরঙ্গ বংশাবলীতে অষ্টাদশ পুত্রের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুই পুত্রের সংবাদ কোনও নাই।

"গোয়ালপাড়া জেলার পর্ব্বত জেয়ারের বনে আঠারকোঠায় ইহাদের রাজধানী ছিল।"

আঠার কোঠা" বর্ত্তমান কোচবিহারের অন্তর্গত পরবর্ত্তী কালে আঠার কোঠায় অস্থায়ী রাজধানী স্থাপিত ছিল।

"নরনারায়ণ কাছাড় পর্য্যন্ত অধিকার করেন ও ভুটানের দুয়ার দখল করেন।"

নরনারায়ণের পিতা মহারাজ বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক ভুটান অধিকৃত হইয়াছিল।

৬৫ পৃষ্ঠার ভ্রম—

"লক্ষ্মীনারায়ণ আকবর বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করেন। ইহাতে রাজার আত্মীয় ও প্রজাগণ রাজার বিরুদ্ধাচরণ করে।"

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এই প্রকারের উক্তি করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকই তাহা বলেন না। তাহার বিস্তারিত আলোচনা এস্থলে সম্ভব নহে। প্রকৃতপক্ষে, আত্মীয়গণের বিরুদ্ধাচরণে বিব্রত হইয়া; লক্ষ্মীনারায়ণ বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

"প্রাণ নারায়ণের পৌত্র মহেন্দ্রনারায়ণ, ১৬৮২ হইতে ১৬৯২ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।"

মহেন্দ্র নারায়ণ, প্রাণ নারায়ণের পৌত্র ছিলেন না, প্রপৌত্র ছিলেন।

"কাজির হাট ও কাকিনা বর্ত্তমান কাকিনারাজ্যের জমিদারি।"

কাজির হাট, কাকিনার জমিদারী কখনও ছিল না এখন ও নহে।

৬৬ পৃষ্ঠার ভ্রম—

'মহীনারায়ণের পুত্র শান্ত নারায়ণ ছত্র-নাজীর হইলেন।" শান্ত নারায়ণ, মহীনারায়ণের পুত্র ছিলেন না। পৌত্র ছিলেন।

"শান্ত নারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রূপনারায়ণ ১৬৯৩ হইতে ১৭১৪ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।"

রূপনারায়ণ শান্তনারায়ণের জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন না।

"এই বলরাম পুর পঞ্চ ক্রোশ খ্যাত এবং কোচবেহারের মধ্যে হইলেও রাজ্য শাসন বহির্ভূত ছিল।"

উল্লিখিত ঘটনার প্রায় একশত বৎসর পরে 'চৌকোশী" বলরাম পুরের সৃষ্টি হয়। "পঞ্চক্রোশ" বলিয়া কোন কথা নাই। চৌকশী কখনও কোচবিহার রাজের শাসন বহির্ভূত ছিল না। চৌকশী বলরামপুর নাজীরবংশের জায়গীর ছিল।

"মহেন্দ্রনারায়ণের পুত্র উপেন্দ্র নারায়ণই ১১৭৪ হইতে ১৭৬৩ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।"

উপেন্দ্র নারায়ণ, মহারাজ রূপনারায়ণের পুত্র ছিলেন। মহেন্দ্র নারায়ণ দূর সম্পর্কিত ছিলেন। উপেন্দ্রনারায়ণ রাজার রাজত্ব কাল ১৭১৪ হইতে ১৭৬৩ খৃঃ পর্য্যন্ত।

"অতঃপর ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ১৭৬৫ হইতে ১৭৮৩ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

১৭৬৫ হইতে ১৭৮৩ খৃঃ পর্য্যন্ত মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ নিরবচ্ছিন্ন রাজত্ব করেন নাই। মধ্যে রাজেন্দ্র নারায়ণও ও ধীরেন্দ্রনারায়ণ ৪।৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন।

"ভুটানের দেবরাজার ভাগিনেয় জীমপে বিশসহস্র সৈন্যসহ কোচবেহারে আগমন করিয়া ধীরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করেন। নাজীর দেও কে তাড়াইয়া দেন।"

প্রকৃত বিবরণ ইহার বিপরীত। ভুটিয়াগণকে তাড়াইয়া দিয়া, নাজীর দেও ধরেন্দ্র ধীরেন্দ্র নহে) নারায়ণকে রাজা করিয়াছিলেন।

"কোম্পানীর সৈন্য আসিয়া ভুটিয়াদিগকে তাড়াইয়া দেয় কিন্তু এই অবধি কোচবেহার রাজ্য ইংরেজ ও ভুটীয়া উভয়ের অধীন হইল। ১৮৬৪ সালে ভুটীয়াগণ দুয়ার হইতে বিতাড়িত হইলে কোচবেহার তাহাদের পাশ ছিন্ন করে।"

এই মন্তব্যের কোন মূল নাই। ১৭৭৩ খৃঃ কোম্পানীর সহিত কোচবিহার রাজের সন্ধি সূত্রে কোচবিহার রাজ্য কোম্পানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিগণিত হয়। সেই অবধি ভূটানের সহিত কোচবিহারের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

"হরেন্দ্র নারায়ণ রাজা হইয়া ১৭৮৩ হইতে ১৮২৯ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।"

মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ ১৮৩৯ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন।

৬৭ পৃষ্ঠার ভ্রম—

"নলডাঙ্গার কাশীকান্ত লাহিড়ী খাসনবীশ পূর্ব্বোক্ত সন্ধির (১৭৭৩ খৃঃ) মূল কারণ ও তিনিই কোচবিহারের প্রকৃত শাসন কর্ত্তা ছিলেন।

সন্ধির মূল কারণ নাজীর দেওর খগেন্দ্র নারায়ণ ছিলেন। কাশীকান্ত রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাহার হস্তে রাজ্যের শাসন কর্ত্তৃত্ব ছিল না।

"হিন্দু ও মুসলমান একমাত্র হিন্দুআইন দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহার কারণ এই যে কোচবিহারের মুসলমানগণ হিন্দু বংশ জাত ও সকলেই 'নস্য' উপাধি বিশিষ্ট। নস্য অর্থ নষ্ট।'

কোচবিহারের মুসলমানগণ হিন্দু আইন দ্বারা পরিচালিত হয় না। কেবল মাত্র উত্তরাধিকার সাহায্যে মুসলমানগণ হিন্দু আইন দ্বারা বিচারিত হয়। যদি কেহ উত্তরাধিকার সম্পর্কে স্বীয় বংশে মুসলমান আইন প্রয়োগ হইবে বলিয়া লিখিত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তাহার বংশধরগণ মুসলমান আইন অনুসারে পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। কোচবিহারের মুসলমানগণ হিন্দু বংশ জাত ও 'নস্য' নষ্ট শব্দজাত কিনা তাহার আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক। প্রবন্ধ লেখক এ সম্বন্ধে কোন স্বাধীন আলোচনা করেন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী ২।১ জন ঐতিহাসিকের অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র।

"ইহার (শিবেন্দ্র নারায়ণ) সন্তান না থাকায় নাজীর দেও বংশ হইতে নরেন্দ্র নারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করেন।"

নরেন্দ্র নারায়ণ নাজীর দেওর বংশীয় নহেন। ইনি মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

৬৮ পৃষ্ঠার ভ্রম—

"১৮৬৩ হইতে ১৯১১ খৃঃ পর্য্যন্ত ভূপেন্দ্র নারায়ণ রাজত্ব করেন।"

নৃপেন্দ্র নারায়ণের স্থলে ভূপেন্দ্র নারায়ণের নাম একাধিক বার ব্যবহৃত হইয়াছে।

নবাবিষ্কৃত প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে প্রবন্ধের আরও অনেক স্থলের প্রতিবাদ হইতে পারে। শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণের তত্ত্বাবধানে কোচবিহারের ইতিহাসের নূতন সংস্করণ হইতেছে। তাহার সহিত তুলনা করিলে, প্রবন্ধের বহু অংশ আপত্তিকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। উহা এখনও অপ্রকাশিত বলিয়া প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হওয়া সঙ্গত হইবে না। কোচবিহারের ইতিহাসের মৌলিক আলোচনার জন্য প্রবন্ধ লেখককে দায়ী করা হইতেছে না। তিনি সাবধানে নকল করিয়া গেলেই এতটা হইত না।

শ্রীআমানত উল্ল্যা আহম্মদ।

['কোচবেহার' প্রবন্ধের প্রতিবাদ পত্রস্থ হইল। কোচবেহারের ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক উপায়ে, এ পর্য্যন্ত গবেষণা হইয়াছে বলিয়া, আমাদের জানা নাই। এজন্য, মূল-প্রবন্ধে অল্প অল্প ভ্রম থাকা, অসম্ভব নয়। যাহা হউক, স্থূল ইতিহাস ও কোচবেহার-রাজ্যের আরম্ভ কালের ঘটনা বিষয়ে বিশেষ মতভেদ লক্ষিত হইতেছে না। তাই, এ বিষয়ে আর বাদ-প্রতিবাদ 'নব্যভারতে' প্রকাশিত হইবে না। ন, স।]

ছাত্রদের অধিকার।

রাজনীতির কথা বলিতেছিনা। খুব সাধারণভাবেই কথাটার আলোচনা করিতে চাই।

স্বাধীনতা-স্পৃহা মানবাত্মার সুস্থ অবস্থাই সূচিত করে। যেখানেই ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, সেখানেই বুঝিতে হইবে, ইহা আত্মার সুস্থ অবস্থা নহে, আত্মাটা রোগাক্রান্ত হইয়াছে, এখন এই রোগ সংস্কারজই হউক, আর বিকারজ, অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ও সুনিশ্চিত প্রভাব জাতই হউক। এই রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, ইহা যে কারণ প্রসূত, তাহার মুলোৎপাটন কর। রোগোৎপত্তির কারণ নিবারণ না করিয়া, শত রকমের ঔষধ সেবন করাইলেও নিরাময় হওয়া অসম্ভব।

স্বাধীন মানুষকে পরাধীনতা রাক্ষসীর করালগ্রাসে পাতিত করিবার জন্য আজ পর্য্যন্ত যত গুলি দৈব ও পার্থিব বিষাক্ত বাষ্প আবিষ্কৃত হইয়াছে, লৌকিক প্রথা বা conventionই যে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। কালকূট বিষের সদা প্রাণঘাতিনী শক্তি, মানুষের মনে ভীতির উদ্রেক করিয়া থাকে, তাই মানুষ নিয়তই তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলে, কিন্তু যে বিষ মানব শরীরে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে মরণের কোলে টানিয়া লয়, যে বিষ সুদক্ষ চিকিৎসকের ও সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া একটু একটু করিয়া নিজের প্রভাব বিস্তার করে, সে বিষ যে তীব্র হলাহল হইতেও মারাত্মক!

স্বাধীনতার স্পৃহা পাছে বা উশৃঙ্খলতারূপ অপদেবতার হাওয়াস্পর্শে ভূতগ্রস্তের খেয়ালে পরিণত হয়, এই ভয়েই মানুষ, ভূমিষ্ঠ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই, নিয়ম কানুনের অসংখ্য রক্ষা কবচ পরিয়া বসিয়া থাকে। জন্ম গ্রহণের পর মুহূর্ত্ত হইতে আমরণ, সে কেবল দিনের পর দিন, সর্ব্বাঙ্গে রক্ষা-কবচই ধারণ করিতেছে। এই রক্ষা-কবচের বোঝার চাপে, একদিকে যেমন তাহার তরুণ দেহটি রক্ষা করা দায় হইয়া উঠে, তেমনি, অপর দিকে, এই নিত্য নূতন নিয়ম পদ্ধতির শৃঙ্খলের চাপে পড়িয়া, তাহার স্বাধীনতা-প্রার্থী আত্মাশিশুটাও আর যেন রক্ষা পাইতে চায় না। পর-প্রবর্ত্তিত এই লৌহ-বেষ্টন অতিক্রম করিয়া, বাহিরের মুক্ত হাওয়ার পরশ লাগিবার যখন সময় হইয়া উঠে, তখন তাহার জীবন দেউটা নিবু নিবু প্রায়। এই অবস্থাই প্রতি নিয়ত সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে।

স্বাধীনতার গান আমরা যতই গাইনা কেন, পারতপক্ষে কিন্তু, প্রায় কেহই আমরা অপরকে স্বাধীনতা দিতে চাই না। ব্যক্তিগত অধিকার লইয়া আজ জগৎময় তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। পূর্ব্ব-প্রচলিত রীতিনীতির দুর্ভেদ্য প্রাচীর কোথায়ও ধসিয়া পড়িয়াছে, কোথায় ও বা পতনোম্মুখ হইয়াছে। সকল দেশের সকল শ্রেণীর মানবের মধ্যেই একটা প্রবল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে যে, সেও জগৎ-স্রষ্টারই স্বহস্ত-সৃষ্ট মানব—সকল মানবের যাহা প্রাপ্য, তার ও তাহাই প্রাপ্য তার এক তিল কমেও সে সন্তুষ্ট হইতে চায় না। সে উপযুক্তই হউক, আর অনুপযুক্তই হউক, পিতৃধনে, অপর ভাইদের মত, তাহারও সমান অধিকার। এ অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার ন্যায্য অধিকার তাহার স্রষ্টারও যে নাই।

আজ তাই সকল দেশেই অধিকার দাবী করিবার স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে। যে ভারত জাগিয়াও ঘুমাইতে ভাল বাসে, আজ সে ভারতেও সর্ব্বত্রই প্রাণের স্পন্দন দৃষ্ট হইতেছে। অপরের উচ্ছিষ্ট অন্ন বা চরণ-স্পৃষ্ট সলিল গ্রহণই এত কাল যাহারা পরমার্থ-লাভের এক মাত্র উপায় মনে করিত, অপরের পাদুকা বহন ও চরণ-সেবার জন্যই যাহারা সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিত, আজ তাহারাও পাশ ফিরিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। আজ তাহারাও কি এক সোনার কাটির শুভ-স্পর্শে রাক্ষস-অধ্যুষিত রাজপুরীর মাঝে জাগিয়া উঠিয়াছে। নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু তন্দ্রার ঘোর এখনও কাটে নাই। রাজপুত্রের মধুর স্পর্শ ব্যতীত সে ঘোর ত কাটিবার নয় কিন্তু রাজপুত্র কোথায়?

স্বর্ণ বণিক জাগিয়াছে, মাহিষ্য জাগিয়াছে, তন্তুবায় জাগিয়াছে, কর্ম্মকার কুম্ভকার জাগিয়াছে, মেথর-ধাঙ্গর জাগিয়াছে, সহিস কোচম্যান জাগিয়াছে, বাড়ীর ঝি-চাকর জাগিয়াছে, কিন্তু জাগেনাই শুধু দুই ব্যক্তি—কে তারা ?

এক জনের নাম. "শিক্ষক" , আর অপরের নাম—"ছাত্র"।

'ছাত্র' জাগে নাই, এত বড় অপবাদটা ছাত্র-মহল যে কিছুতেই ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইবে না, তা আমরা বেশ ভালরূপেই জানি। বাস্তবিক পক্ষেও তাহারা যে একেবারেই জাগে নাই, তাও তো নয় ? তবে তাহারা জাগিয়া বিছানায়ই পড়িয়া আছে, তন্দ্রাঘোরে শুধু একবার এপাশ একবার ওপাশ করিতেছে, এই নড়াচড়াটুকুই তাদের জাগরণের সাক্ষ্য দিতেছে, এই পর্য্যন্ত। নচেৎ, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই।

শিক্ষকগণ জাগিবেন, সেত দূরের কথা, তাঁহারা যে আজও বাঁচিয়া আছেন, তার একমাত্র সাক্ষী তাঁদের বজ্রমুষ্টি-প্রসূত ছাত্রবৃন্দ, নচেৎ সকলে হয়ত এতদিন তাঁহাদের আগ্যশ্রাদ্ধ, সপিণ্ড-করণ, এমন কি গয়ার পিণ্ডদানেরও ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিত। ভারত-সাগরের বুকের উপর দিয়া যে প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া চলিয়াছে, তার ধাক্কায় সাড়া দেয় নাই, এমন কোনও প্রাণীই ত প্রায় দেখিলাম না। তবে জানি না, এই শিক্ষক-নামক জীব কোন্ দেবতার বা অপ-দেবতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। মেথর ধাঙ্গর—যাদের নামোচ্চারণও নাকি অনেকের অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠিয়া পড়িবার উপক্রম হয়, হায়রে অদৃষ্ট, তাহারাও এ সুযোগে নিজ নিজ মাহিয়ানাটা বাড়াইয়া লইল। আর ধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মাকামারা শিক্ষিতাভিমানী শিক্ষক মহাশয়গণ, আপনারা সেই সওয়া নয় সিকি মাহিয়ানার গৃহ-শিক্ষকতা এবং একশত সিকি মাহিয়ানা বিদ্যালয়ের শিক্ষকই রহিয়া গেলেন। এক শত কথাটার উপর জোর দিয়া, সিকি কথাটা আস্তে বলিলাম, শুধু মান বাঁচাইবার জন্য।

বর্ত্তমান যুগে, শিক্ষক মহাশয়গণের 'অধিকার' বলিয়া কিছুই নাই। তবে নিজ নিজ গৃহে কাহারও কাহারও থাকিলেও বা থাকিতে পারে। সন্দেহের কথা। সুতরাং তাদের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। ছাত্রদের কথাই বলা যাউক।

'মানসিক দাসত্বের' জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে গলা আঁকড়াইয়া আমরা যতই গাল দিই না কেন, কিন্তু সেই অপূর্ব্ব পদার্থটি সপ্তম স্বর্গরূপ বিদ্যালয়েই যে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহের লেশ মাত্র নাই। আর ইহাও সত্য যে, সেই অমৃতের স্রষ্টা হচ্ছেন—পতিতপাবন, অধমতারণ, মহাগুরু, কল্পতরু, শিক্ষক মহোদয়গণ। শিক্ষক মহোদয়গণ ক্ষমা করিবেন, কথাটা কিন্তু নিখুঁত সত্য।

ছাত্রদিগকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রেই দেখিতে হইবে, যাহাতে তাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ও কাজ করিতে পারে। অধিকাংশস্থলেই, ছাত্রগণকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে, কাজ করিতে, কিম্বা কথা বলিতে দেওয়া হয় না। তাহাদেরও যে, ভালমন্দ, ন্যায়ান্যায়, সুবিধা অসুবিধা, বা দুঃখ কষ্ট বোধ আছে, প্রায় কোথায়ও তাহা আমলেও আনা হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন কোনও একখানা বেঞ্চিতে পাঁচ জনের বসিতেই বেশ একটুকু কষ্ট হয়, সেই বেঞ্চিতে ছয়জনকে বসিতে হইলেও, তাহারা মুখ ফুটিয়া তাহাদের অসুবিধার কথা বলিতে পারে না, এবং বলিলেও, তার ফলাফলটা প্রায়ই খুব সুখকর হয় না ; অথবা, দারুণ গ্রীষ্মের দিনেও পাখার বন্দোবস্ত নাই দেখিয়া তাহারা তাহাদের অসুবিধার কথা জ্ঞাপন করিতে পারে না ; বলিলে, অধিকাংশস্থলেই তিরস্কৃত বা প্রহৃত হইয়া থাকে। (যদিও পাখাগুলি চলে তাহাদের প্রদত্ত অর্থের সাহায্যেই)। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত প্রহৃত হইয়াও তাহারা জোরে কাঁদিতে পারে না, পাছে বা প্রধান-শিক্ষক মহাশয় শুনিয়া একটা কৈফিয়ৎ তলব করিয়া ফেলেন; নির্য্যাতিত বা তিরস্কৃত